

# বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

দাখিল  
সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ  
থেকে দাখিল সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

# বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

## দাখিল সপ্তম শ্রেণি

রচনার্থ

প্রফেসর ড. অনিলকুমার কাহালি

প্রফেসর ড. দেলওয়ার মফিজ

গৌতম গোস্বামী

সম্পাদনার্থ

প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ: সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

## প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলা ও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্মর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি পাঠ্যপুস্তকটি একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে পরিমার্জিত কারিকুলামের আলোকে সম্মত শ্রেণির জন্য রচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংজ্ঞাত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলভুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকবূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাই।

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## সূচিপত্র

ক্রমিক নং	পাঠ শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.	ভাষা	১-৯
২.	ব্যাকরণ	১০-১১
৩.	খনি ও বর্ণ	১২-১৭
৪.	সঙ্গি	১৮-২৬
৫.	শব্দ ও পদ	২৭
৫.১	কারক ও বিভক্তি	২৭-৩৪
৫.২	সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ	৩৪-৩৮
৫.৩	শব্দকর্প	৩৯-৪০
৫.৪	বিশেষণের 'ত্র' ও 'ত্রম'	৪১-৪২
৬.	শব্দগঠন	৪৩-৪৫
৬.১	উপসর্গযোগে শব্দগঠন	৪৫-৫২
৬.২	প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন	৫২-৫৭
৭.	বাক্য	৫৮-৬২
৮.	বিরামচিহ্ন	৬৩-৬৭
৯.	বানান	৬৮-৭৩
১০.	শব্দার্থ	৭৪
১০.১	একই শব্দের বিভিন্ন অর্থের প্রয়োগ	৭৪-৭৮
১০.২	বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা	৭৮-৮২
১০.৩	সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা	৮২-৮৫
১০.৪	এক কথায় প্রকাশ	৮৫-৮৮
১০.৫	বাগ্ধারা	৮৮-৯০

ক্রমিক নং	পাঠ শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১১.	নিয়মিতি	৯২-১২৮
১১.১	রচনা	৯২-১১০
	১. আমাদের জাতীয় পতাকা	৯২
	২. আমাদের গ্রাম	৯৩
	৩. দর্শনীয় স্থান	৯৪
	৪. বাংলাদেশের নদনদী	৯৬
	৫. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম	৯৭
	৬. কী ধরনের বই আমার পড়তে ভালো লাগে	৯৯
	৭. আমার চারপাশের প্রকৃতি	১০০
	৮. আমার দেখা একটি মেলা	১০২
	৯. একটি দিনের দিনলিপি	১০৩
	১০. শহিদ মিনার	১০৫
	১১. টেলিভিশন	১০৬
	১২. শৃঙ্খলাবোধ	১০৮
	১৩. সুন্দরবন	১০৯
১১.২	অনুধাবন দক্ষতা	১১১
১১.৩	সারাংশ/সারমর্ম	১১২-১১৪
১১.৪	ভাবসম্প্রসারণ	১১৫-১২০
১১.৫	আবেদনপত্র ও চিঠি	১২১-১২৮

## ভাষা

মানুষ ভাষা-সম্পদের অধিকারী। ভাব প্রকাশের প্রয়োজন থেকেই ভাষার উদ্ভব। মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা। পরম্পর ভাব-বিনিময়ের জন্য এক-এক সমাজের মানুষ গড়ে তুলেছে এক-এক রকম ধ্বনিব্যবস্থা। ভাষা হচ্ছে অর্থবহ প্রণালিবদ্ধ ধ্বনি-প্রতীক। মানুষ তার কষ্টনিঃস্ত যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির মাধ্যমে ভাব ও অনুভূতিকে অন্যের কাছে বোধগম্যভাবে পৌছে দেয়, তা-ই ভাষা (Language)। ভাষা মানবগোষ্ঠীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে ভাষা একটি উন্নত মাধ্যম।

মানবসভ্যতার বিকাশে ভাষার ভূমিকা অপরিসীম। আদিমকালে মানুষ যখন গুহাবাসী, বন্য ও অসভ্য ছিল, তখনো মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করত। তখন ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম ছিল ইশারা-ইঙ্গিত-অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি। এগুলো ভাষা বিকাশের প্রাথমিক রূপ হিসেবে বিবেচ্য। বস্তুত আদিকালে মানুষ পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের জন্য যেসব মাধ্যম ব্যবহার করত সেগুলো হলো :

(ক) ইশারা-ইঙ্গিত, (খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার, (গ) নাচ, (ঘ) চিত্র ইত্যাদি।

সৃষ্টির প্রথম যুগে সভ্যতার সোপানে প্রথম পদক্ষেপ হলো সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা। আর এ থেকেই তৈরি হলো সমাজ। কালের যাত্রায় মানুষ যখন সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে শুরু করল, তখন সে বুঝতে পারল যে কেবল ইশারা-ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। নিরন্তর প্রচেষ্টা, বুদ্ধি ও সাধনার মাধ্যমে কালক্রমে মানুষ ধ্বনির প্রণালিবদ্ধ উচ্চারণ ও ব্যবহারে সক্ষম হলো।

মানুষের কষ্টনিঃস্ত বাগ্ধ্বনিই ভাষা হিসেবে গৃহীত। বলা বাহ্য, ইঙ্গিতের মাধ্যমেও ভাবের আদান-প্রদান করা যায়, কিন্তু কষ্টধ্বনি হচ্ছে মানুষের অনুভূতি প্রকাশের সর্বোত্তম প্রক্রিয়া। কষ্টধ্বনির মাধ্যমে মানুষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশে সক্ষম। তাই আমরা ভাষা বলতে বুঝি বাগ্যন্ত্র-সৃষ্টি সর্বজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিকে। অর্থাৎ মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কষ্ট, জিহ্বা, ওষ্ঠ, দন্ত, নাসিকা, মুখবিবর প্রভৃতি বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে বোধগম্য যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে থাকে, সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।

### ভাষার সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্য

**সংজ্ঞার্থ :** মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মনুষ্যজাতি অপরের বোধগম্য যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে থাকে, তাকে ভাষা বলে।

ভাষাবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে ভাষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন প্রখ্যাত ভাষাপণিতের ভাষা-সম্পর্কিত চিন্তাসূত্র উন্নত করা হলো :

ডষ্টের মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, ‘মনুষ্যজাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনিসকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তার নাম ভাষা।’

ভাষা সম্পর্কে ডষ্টের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ‘মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্যস্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত, ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।’

মূলত মানুষের মনোভাব-প্রকাশক কর্তৃনিঃসৃত অর্থবহু ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।

## ভাষার বৈশিষ্ট্য

১. ভাষা কর্তৃনিঃসৃত ধ্বনির সাহায্যে গঠিত;
২. ভাষার অর্থদ্যোতকতা গুণ বিদ্যমান;
৩. ভাষা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ও ব্যবহৃত;
৪. ভাষা মানুষের ব্রেচ্ছাকৃত আচরণ ও অভ্যাসের সমষ্টি;

দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে। আদি মানবের যে ভাষা ছিল, কালের প্রবাহে তা পরিবর্তিত হয়ে বহু ভাষার জন্ম দিয়েছে। এ জন্য আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই। যেমন : বাংলাদেশে ‘বাংলা ভাষা’, ইংল্যান্ডে ‘ইংরেজি ভাষা’, জাপানে ‘জাপানি ভাষা’, রাশিয়ায় ‘রুশ ভাষা’ ইত্যাদি। বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের ওপর ভাষা প্রচলিত আছে।

## বাংলা ভাষার উন্নত ও ক্রমবিকাশ

বাংলা ভাষা হাজার বছরের পুরনো। বাংলা ভাষার উৎসমূলে যে ভাষার সঙ্কান পাওয়া যায়, তার নাম ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইউরোপের মধ্যভাগ হতে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ভূভাগে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা প্রচলিত ছিল। এ ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাই হলো বাংলা ভাষার আদি উৎস। তবে এ আদি উৎস থেকে বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেই বাংলা ভাষার জন্ম হয়নি। ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় অনেক কাল ধরে অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে সঙ্গম শক্তকে বাংলা ভাষার উন্নত ঘটেছে। তবে বাংলা ভাষার উন্নতকাল নির্ণয়ে পশ্চিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ডষ্টের মুহুম্বদ শহীদুল্লাহুর মতে, বাংলা ভাষার উন্নতকাল ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ। আর ডষ্টের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দকে বাংলা ভাষার উন্নতকাল বলে মনে করেন।

## সাধু ও চলিত রীতি : সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পার্থক্য

বাংলাদেশের মানুষ তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে, তার নাম বাংলা ভাষা। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা, প্রিপুরা, আসামের করিমগঞ্জ ও কাছাড়ের অধিবাসীদের একটি অংশের মাতৃভাষা বাংলা। বস্তুত, দেশ-জাতি-ধর্মনির্বিশেষে বাঙালি জনসমাজে ব্যবহৃত শব্দ নিয়ে বাংলা ভাষা গঠিত। বাংলা ভাষা প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর সব ভাষাতেই দুটো রূপ দেখা যায়। একটি

লেখার ভাষা, অন্যটি মুখের ভাষা। ভাষারীতির দিক থেকে বাংলা ভাষার দুটি রূপ বা রীতি লক্ষ করা যায়। একটি সাধু ভাষা এবং অপরটি চলিত ভাষা।

### সাধু ভাষা

সাধু ভাষা বাংলা ভাষার একটি প্রাচীন লিখিত রূপ। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগে পদ্যই ছিল ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন। মধ্যযুগে কতিপয় ক্ষেত্রে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজে গদ্যের ব্যবহার দেখা গেলেও তা ছিল খুবই সীমিত। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলা গদ্যে গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে গদ্যচর্চা শুরু হয়। সেদিনকার গদ্য লেখকগণ গদ্যগ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে মূলত নির্ভর করলেন সাধুজনের মধ্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষার ওপর। এভাবে উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের যে লিখিত রূপ গড়ে ওঠে, তার নাম দেওয়া হয় সাধু ভাষা। সাধু ভাষা সম্পর্কে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘সাধু ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশের সম্পত্তি। এর চর্চা সর্বত্র প্রচলিত থাকাতে বাঙালির পক্ষে ইহাতে লেখা সহজ হইয়াছে।’

বৃষ্টির বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষার অনুসরণে তৎসম শব্দবক্তৃ যে সাহিত্যিক গদ্যরীতি গড়ে তোলেন, তা-ই সাধু ভাষা হিসেবে স্বীকৃত।

### সাধু ভাষার প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ

- সাধারণ গদ্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙালা ভাষাকে সাধু ভাষা বলে। — ডষ্টের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
- বাংলা ভাষার সংস্কৃত শব্দ-সম্পদ ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের পূর্ণরূপ এবং ব্যাকরণসিদ্ধ উপাদান ব্যবহার করিয়া ইংরেজি গদ্য-সাহিত্যের পদবিন্যাস প্রণালির অনুসরণে পরিকল্পিত যে নতুন সর্বজনীন গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তিত হয়, তাহাকে বাংলা সাধু ভাষা বলে। — ডষ্টের মুহম্মদ এনামুল হক

মূলত যে ভাষারীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ পূর্ণরূপে বর্তমান থাকে, তা-ই সাধু ভাষা। যেমন : তাহারা খেলিতেছে। উহারা ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

### চলিত ভাষা

কোনো একটি প্রধান ভাষার আওতাভুক্ত সমগ্র ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কথ্যরূপ বা মৌখিক ভাষা ব্যবহৃত হয়। মুখের ভাষাকে লিখিত ভাষায় ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে চলিত ভাষার প্রচলন হয়। তবে সবার মুখের ভাষাই চলিত ভাষা নয়, কারণ মুখের ভাষা অঞ্চলভেদে পরিবর্তন হয়। তাই নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট এলাকার শিক্ষিত ও শিষ্টজনের মৌখিক ভাষাকে মান চলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী এলাকা এবং কলকাতার অন্তর্বর্তী শিক্ষিত জনগণ এ আদর্শ ভাষাটিকে অল্প-বিস্তৃত পরিমার্জিত করে একটি সর্বজনবোধ্য আদর্শ কথ্য ভাষা গড়ে তোলা হয়। এটাই হলো বাংলার আদর্শ চলিত ভাষা। বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিত জনগণ এ আদর্শ ভাষাতেই পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। চলিত ভাষা বর্তমানে একাধারে লেখার ভাষা ও মুখের ভাষা।

### চলিত ভাষার প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ

- দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা, সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ মৌখিক ভাষা বলে গৃহীত হইয়াছে। এই মৌখিক ভাষাকে বিশেষভাবে চলিত ভাষা বলা হয়। — ডষ্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
  - তত্ত্ব শব্দ, সংকুচিত ক্রিয়া, ত্রুটীকৃত সর্বনাম পদ এবং লেখকের মনোভাব অনুসারী পদবিন্যাস প্রণালির ব্যবহারসহ যে স্বচ্ছন্দ, চটুল ও সর্বজনীন সাহিত্যিক গদ্যরীতি কলিকাতা ও ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের মুখের ভাষার আদলে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার নাম চলিত ভাষা। — ডষ্টর মুহুম্মদ এনামুল হক
- মূলত যে ভাষারীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহৃত হয়, তাকে চলিত ভাষা বলে। যেমন : তারা খেলছে। ওরা ঘূমিয়ে রয়েছে।

প্রধানত ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের পার্থক্য বিবেচনা করেই সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা নিরূপণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : ‘তাহারা পড়িতেছে’— বাক্যটিতে দুটি পদ আছে। ‘তাহারা’ সর্বনাম পদ এবং ‘পড়িতেছে’ ক্রিয়াপদ। সাধু ভাষার উল্লিখিত পদ দুটোতে সর্বনাম পদ ও ক্রিয়াপদ পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এবার বাক্যটিকে চলিত ভাষায় বৃপ্তান্তের করলে তার রূপ দাঁড়াবে ‘তারা পড়ছে’। এ ক্ষেত্রে বাক্যটিতে ‘তারা’ সর্বনাম পদ এবং ‘পড়ছে’ ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহৃত হয়েছে।

সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ : করিতেছি, খাইয়াছি, বলিতেছি, যাইতেছি, পড়িতেছি, দেখিতেছি ইত্যাদি।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ : করছি, খেয়েছি, বলছি, যাচ্ছি, পড়ছি, দেখছি ইত্যাদি।

সাধু ভাষার সর্বনাম পদ : তাহার, তাহারা, তাহাদের, উহাদের ইত্যাদি।

চলিত ভাষার সর্বনাম পদ : তার, তারা, তাদের, ওদের ইত্যাদি।

**সাধু ভাষা ও চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের কতিপয় রূপ :**

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
করিব	করব
পড়িব	পড়ব
লিখিব	লিখব
করিতেছিলাম	করছিলাম
পড়িতেছিলাম	পড়ছিলাম
লিখিয়াছি	লিখেছি
করিয়াছি	করেছি
পড়িয়াছি	পড়েছি
পড়িতে থাকিব	পড়তে থাকব

করিতেছি	করছি
করিলাম	করলাম
খাইতেছে	খাচ্ছে
হইত	হতো
খাইবে	খাবে
যাইবে	যাবে
বলিব	বলব
করিলে	করলে
যাইও	যেয়ো/যেও
খাইও	খেয়ো/ খেও
লইব	নেব
করিতাম	করতাম
হইয়া	হয়ে

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষায় সর্বনাম পদের কতিপয় রূপ :

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
তাহার	তার
তাহাদের	তাদের
তাহাতে	তাতে
তাহারা	তারা
তাহাকে	তাকে
ইহারা	এরা
ইহাদের	এদের
উহারা	ওরা
উহাদের	ওদের
উহা	ও
এই	এ
ইহা	এটি
ইহাকে	একে
কাহার	কার
যাহা	যা

যাহারা	যারা
ইহার	এর
কাহাকে	কাকে
যাহাকে	যাকে

### সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা নানা দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। এ উভয় ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো :

### সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য

১. সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ পূর্ণাঙ্গ। যেমন : করিয়াছি, গিয়াছি।
২. সাধু ভাষায় সর্বনাম পদের রূপ পূর্ণাঙ্গ। যেমন : তাহার, তাহারা, তাহাদের।
৩. সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : হইতে, দিয়া।
৪. সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের (সংস্কৃত শব্দ) প্রয়োগ বেশি। যেমন : হস্ত, মস্তক, ঘৃত, ধৌত।
৫. সাধু ভাষার উচ্চারণ গুরুগম্ভীর।
৬. সাধু ভাষা সুনির্ধারিত ব্যাকরণের অনুসারী। এর কাঠামো সাধারণত অপরিবর্তনীয়।
৭. সাধু ভাষা বক্তৃতা ও নাট্য সংলাপের অনুগম্যোগী।

### চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য

১. চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ সংক্ষিপ্ত। যেমন : করেছি, গিয়েছি।
২. চলিত ভাষায় সর্বনাম পদের রূপ সংক্ষিপ্ত। যেমন : তারা, তাদের।
৩. চলিত ভাষায় অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : হতে, দিয়ে।
৪. চলিত ভাষায় তত্ত্ব, অর্ধ-তৎসম, দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি। যেমন : হাত, মাথা, ঘি, খোয়া।
৫. চলিত ভাষার উচ্চারণ হালকা ও গতিশীল।
৬. চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল।
৭. চলিত ভাষা চটুল, জীবন্ত ও লোকায়ত।

### সাধু ও চলিত ভাষারীতির পার্থক্য

সাধু ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য থেকে এ ভাষারীতির পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। নিচে সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য উল্লেখ করা হলো :

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ পূর্ণাঙ্গ। যেমন : করিয়াছি, গিয়াছি।	চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ সংক্ষিপ্ত। যেমন: করেছি, গিয়েছি।
সাধু ভাষায় সর্বনাম পদের রূপ পূর্ণাঙ্গ। যেমন: তাহার, তাহারা, তাহাদের।	চলিত ভাষায় সর্বনাম পদের রূপ সংক্ষিপ্ত। যেমন : তার, তারা, তাদের।
সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের (সংস্কৃত শব্দ) প্রয়োগ বেশি। যেমন : হস্ত, মস্তক, ঘৃত, ধোত।	চলিত ভাষায় তৎব, অর্ধ-তৎসম, দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি। যেমন : হাত, মাথা, ঘি, ধোয়া।
সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : হইতে, দিয়া।	চলিত ভাষায় অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : হতে, দিয়ে।
সাধু ভাষা বক্তৃতা ও নাট্য সংলাপের অনুপযোগী।	চলিত ভাষা বক্তৃতা ও নাট্য সংলাপের উপযোগী।
সাধু ভাষা মার্জিত।	চলিত ভাষা চটুল, জীবন্ত ও লোকায়ত।

### সাধু ও চলিত ভাষার নমুনা

#### সাধু ভাষার নমুনা

১. বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করা, তাহা হইলে বড় হইয়া অনায়াসে সকল কর্ম করিতে পারিবে, স্বয়ং অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না এবং বৃক্ষ পিতামাতার প্রতিপালন করিতেও পারণ হইবে।

[ বোধোদয় : ঈশ্বরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগর]

২. যাহা জ্ঞানের কথা তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞান সমষ্টে নৃতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কাল যাহা পঞ্জিতের অগম্য ছিল আজ তাহা অর্বাচীন বালকের কাছেও নৃতন নহে। [সাহিত্যের সামগ্রী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

#### চলিত ভাষার নমুনা

১. আমাদের মনে হয় এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশি। এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন। কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন; কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছিনে; যদিও এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।

[বই পঢ়া : প্রমথ চৌধুরী]

২. বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলক্ষ্মি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়।

তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সজীবতা ও সার্থকতার এমন দৃষ্টান্ত আর নেই।

[জীবন ও বৃক্ষ : ঘোতাহের হোসেন চৌধুরী]

## ভাষারীতির পরিবর্তন

### (ক) সাধু থেকে চলিত

সাধুরীতি	চলিতরীতি
পথে এক যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।	পথে এক যুবকের সঙ্গে তার দেখা হলো।
গফুর চুপ করিয়া রহিল।	গফুর চুপ করে রইল।
পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই।	পাকা দুক্রোশ পথ হেঁটে স্কুলে বিদ্যা অর্জন করতে যাই।
আমি ব্যাপারটা বুঝিয়া আমার বিছানা গুটাইয়া লইয়া তাহাদের স্থান করিয়া দিলাম।	আমি ব্যাপারটা বুঝে আমার বিছানা গুটিয়ে নিয়ে তাদের জায়গা করে দিলাম।
আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।	আমিনা ঘর হতে দুয়ারে এসে দাঁড়াল।

### (খ) চলিত থেকে সাধু

চলিতরীতি	সাধুরীতি
চেয়ে দেখি, আমাদের রহমতকে দু পাহারাওয়ালা বেঁধে নিয়ে আসছে।	চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে।
হাজার বছর ধরে মানুষ এদের দেখছে।	হাজার বছর ধরিয়া মানুষ ইহাদের দেখিতেছে।
পাশেই কিছু দূরে একটা শালুক দেখতে পায় ওসমান।	পার্শ্বেই কিছু দূরে একটি শালুক দেখিতে পায় ওসমান।
আমাদের এ ভীরুতা কি চিরদিনই থেকে যাবে?	আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে?
এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন।	এই কথা শুনিয়া অনেকে চমকিয়া উঠিবেন।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

১। বাংলা ভাষার উৎসমূল কোন ভাষা ?

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| ক. আর্য ভাষা        | খ. সংস্কৃত মূলভাষা        |
| গ. গোড়ীয় বঙ্গভাষা | ঘ. ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষা |

২। নিচের কোন বাক্যটি সাধু ভাষার উদাহরণ ?

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ক. আমি আজ বাড়ি যাব।       | খ. আমি আজ সুস্থবোধ করিতেছি। |
| গ. তাকে আমার খুব প্রয়োজন। | ঘ. আমি আজ বই মেলায় যাব।    |

৩। চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো-

- ক্রিয়া পদের রূপ সংক্ষিপ্ত হয়
- সর্বনাম পদের রূপ সংক্ষিপ্ত হয়
- উচ্চারণ খুবই গুরুগম্ভীর

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### কর্ম-অনুশীলন

১। ভাব প্রকাশ, অর্থবহুতা, বাগ্-যন্ত্র-এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে ভাষার একটি সংজ্ঞা তৈরি কর।

--

৪। প্রদত্ত শব্দগুলোর পরিবর্তিত রূপ ডান পাশের সঠিক ঘরে বসাও : কাহাকে, যার, উহাদের, করিলাম, চেনা, গ্রাম্য, পূজা, বরং, তথাপি, হচ্ছে।

প্রদত্ত শব্দ	সাধু	চলিত

## ২. ব্যাকরণ

### ব্যাকরণ

ব্যাকরণ ভাষার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের শাস্ত্র। ভাষা বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হয় এবং বিভিন্ন রীতিতে ব্যবহৃত হয়। গঠন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিটি ভাষারই নিজস্ব কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে। এ নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে হলে ভাষার বিভিন্ন উপাদান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রণালির স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ভাষার এ স্বরূপ বিশ্লেষণই ‘ব্যাকরণ’ নামে অভিহিত।

ব্যাকরণ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই— বি (বিশেষ) + আ (সম্যক) +  $\sqrt{ক} + অন$  = ব্যাকরণ। এ বিশিষ্ট অর্থ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ‘ব্যাকরণ’ হচ্ছে ‘শব্দ ব্যৃৎপদক ও ভাষা নিয়মক শাস্ত্র’। ব্যাপকভাবে বলা যায়, ব্যাকরণ হচ্ছে ‘ভাষার উচ্চারণ নিবারক, শব্দের ব্যৃৎপত্তি ও ব্যৃৎপত্তিগত অর্থ-নির্ধারক, পদ-সাধক এবং বাক্য রচনা প্রণালি নির্ধারক শাস্ত্র।’ ব্যাকরণের কাজ ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিক্ষার করা। ভাষার গঠন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব কিছু নিয়মরীতি আছে। এসব নিয়মরীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে ভাষাকে ভেঙে তার উপাদানসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রণালি নির্ণয় করা প্রয়োজন। সুতরাং ‘যে শাস্ত্রের দ্বারা ভাষাকে বিশ্লেষণ করে এর বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়, তার নাম ব্যাকরণ।’ এ পর্যায়ে ব্যাকরণ সম্পর্কে কয়েকজন খ্যাতনামা ভাষাপত্তিতের মন্তব্য নিচে উদ্ধৃত হলো :

ডষ্টের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, যে বিদ্যার দ্বারা কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বৰূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার গঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুন্দ-রূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে। ব্যাকরণ সম্পর্কে ডষ্টের সুকুমার সেন : যে বইয়ে ভাষার বিচার ও বিশ্লেষণ আছে, তা-ই ব্যাকরণ। মুনীর চৌধুরী বলেছেন : যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তা-ই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ।

### বাংলা ব্যাকরণ

বাংলা ভাষা একটি সমৃদ্ধ ভাষা। এ ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক বা গঠনগত নিয়মশৃঙ্খলা রয়েছে। সুতরাং ‘যে পুস্তকে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তা-ই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ।’

### বাংলা ব্যাকরণের প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ

- যে শাস্ত্র জানিলে বাঙালা ভাষা শুন্দরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙালা ব্যাকরণ (Bengali Grammar)। — ডষ্টের মুহুমদ শহীদুল্লাহ
- যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি সব দিক দিয়ে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বা বাংলা ব্যাকরণ। — ডষ্টের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
- যে ব্যাকরণ বাংলা ভাষার ধ্বনি, শব্দ, পদ, বাক্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে ভাষার স্বরূপটিকে তুলে ধরে, তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে। — জ্যোতিভূষণ চাকী

## ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ভাষাকে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা থেকেই ব্যাকরণের উদ্ভব। লক্ষণীয় যে আগে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, পরে ভাষা বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়েছে। ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভাষা বহুতা নদীর মতো গতিশীল। নিজের খেয়াল-খুশিমতো আপন গতিতে ভাষা এগিয়ে চলে। ফলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভাষার মধ্যে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে ভাষার গতিবিধি লক্ষ করা এবং ভাষাকে বিশ্লেষণ করা। ভাষার মৌলিক উপাদান ধ্বনি, শব্দ, বাক্য—এগুলোর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কারের জন্য ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাকরণকে ভাষার সংবিধান বলা হয়। ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে না, তবু ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তাকে অস্থীকার করা যায় না। ব্যাকরণ পাঠ এ জন্য প্রয়োজন যে—

১. ব্যাকরণ ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে নিরূপণ করে।
২. ব্যাকরণ পাঠ করে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি এবং সে সবের সুষ্ঠু ব্যবহার-বিধি সম্পর্কে জানা যায়।
৩. ব্যাকরণ পাঠ করে লেখায় ও কথায় ভাষা প্রয়োগে শুন্দতা রক্ষা করা যায়।
৪. ব্যাকরণ পাঠে ভাষার সৌন্দর্য অনুধাবন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
৫. ব্যাকরণ সাহিত্যের রস আস্থাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
৬. ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে ছন্দ-অলংকার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়।
৭. ভাষার পরিবর্তনের ধারা, নিয়ম-শৃঙ্খলার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ ব্যাকরণ পাঠে অবহিত হওয়া যায়।

সুতরাং ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং ভাষার শুন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্থীকার্য।

## বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ—ভাষার চারটি মৌলিক উপাদান। এই উপাদানগুলোর ওপর ভিত্তি করেই সব ভাষার ব্যাকরণে নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলা ব্যাকরণও এর ব্যতিক্রম নয়।

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics),
২. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology),
৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax) ও
৪. অর্থতত্ত্ব (Semantics)।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

- ১। ব্যাকরণকে ভাষার কী বলা হয় ?

- |            |            |
|------------|------------|
| ক. অভিভাবক | খ. সংবিধান |
| গ. উপাদান  | ঘ. গাইড    |

## ৩. ধ্বনি ও বর্ণ

### ধ্বনি

ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি। কোনো ভাষার উচ্চারিত শব্দকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে তার যে অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ পাওয়া যায়, তা-ই ধ্বনি। মানুষের বাগ্যস্ত্রের সহায়তায় উচ্চারিত ধ্বনি থেকেই ভাষার সৃষ্টি। বস্তুত ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে চারটি মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়। এই উপাদানগুলো হলো—ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ। মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য ‘কথা’ বলে। মানুষের ‘কথা’ হলো অর্থযুক্ত কিছু ধ্বনি। ব্যাকরণ শাস্ত্রে মানুষের কষ্টনিঃসৃত শব্দ বা আওয়াজকেই ধ্বনি বলা হয়। বস্তুত অর্থবোধক ধ্বনিসমূহই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্ধ্বনি। ধ্বনিই ভাষার মূল ভিত্তি।

ডষ্ট্রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ‘কোনো ভাষার উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলো ধ্বনি পাই।’ বলা বাহ্য্য, প্রতিটি মানবভাষায় থাকে একগুচ্ছ ধ্বনি। এর সংখ্যা সাধারণত বারোটির বেশি ও ঘাটটির কম। এই মুষ্টিমেয় সংখ্যক ধ্বনির বিভিন্ন বিন্যাসে গড়ে ওঠে ভাষার বিপুল পরিমাণ শব্দ। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব ধ্বনিরাশির তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি ভাষার ধ্বনিরাশি পরম্পরের সঙ্গে সহাবস্থান করে সুশৃঙ্খল ধ্বনিতত্ত্বিক নিয়ম-কানুন মেনে চলে। মূলত প্রতিটি ভাষাই একটি সুনির্দিষ্ট ধ্বনিশৃঙ্খলা বা ধ্বনি-সংগঠনের অধীন। ধ্বনি নির্গত হয় মুখ দিয়ে। ধ্বনি উৎপাদনে মুখ, নাসিকা, কণ্ঠ প্রভৃতি বাক্-প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হলেও ধ্বনি উৎপাদনের মূল উৎস হলো ফুসফুস। ফুসফুসের সাহায্যে আমরা শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি। ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে আসার সময় বিভিন্ন বাক্-প্রত্যঙ্গের সংস্পর্শে আসে। ফুসফুস থেকে বাতাস স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় মুখের বিভিন্ন জায়গায় ঘষা থায়। এই ঘর্ষণের ফলে মুখে নানা ধরনের ধ্বনির সৃষ্টি হয়। লক্ষণীয়, ধ্বনি উৎপাদনে ফুসফুস একটি মুখ্য উৎপাদক যন্ত্র হলেও ফুসফুস থেকে ধ্বনি উৎপন্ন হয় না—ফুসফুস থেকে কেবল নির্গত হয় বাতাস। আর এই বাতাসের সঙ্গে নানা বাক্-প্রত্যঙ্গের সংঘর্ষে ধ্বনির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ফুসফুস নির্গত বাতাস স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে মুখগহরে প্রবেশের পর বিভিন্ন বাক্-প্রত্যঙ্গের সংস্পর্শে আঘাত লাগার দরুণ ধ্বনি গঠিত বা তৈরি হয়। ধ্বনি গঠনে বিভিন্ন বাক্-প্রত্যঙ্গের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

### ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

‘ধ্বনি’র সাধারণ অর্থ যেকোনো ধরনের ‘আওয়াজ’। কিন্তু ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের পারিভাষিক অর্থে মানুষের বাগ্যস্ত্রের সাহায্যে তৈরি আওয়াজকে ধ্বনি বলে। ধ্বনি দুই প্রকার। যেমন : ক. স্বরধ্বনি ও খ. ব্যঞ্জনধ্বনি।

### বর্ণ

কোনো ভাষার ধ্বনিগুলোকে লিখে প্রকাশ করার জন্য যে প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তাকে বর্ণ বলে। অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বাংলা ভাষার একেকটি ধ্বনি-প্রতীক বা বর্ণ।

### বর্ণমালা

কোনো ভাষার বর্ণসমষ্টির সুনির্দিষ্ট সাজানো ক্রমকে বর্ণমালা বলে। ধ্বনি যেমন দুই প্রকার—স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি; তেমনি এদের লিখিত প্রতীকও দুই প্রকার। যথা : স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।

### স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণ

যেসব ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে পূর্ণ ও স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়, তাকে স্বরধ্বনি বলে। আর এই স্বরধ্বনির প্রতীক বা লিখিত রূপই হচ্ছে স্বরবর্ণ। যেমন : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঝ, এ, ঐ, ঔ, ও, ঔ। স্বরবর্ণের সংখ্যা মোট ১১টি।

### ব্যঙ্গনধ্বনি ও ব্যঙ্গনবর্ণ

যেসব ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে পূর্ণ বা স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না, তাকে ব্যঙ্গনধ্বনি বলে। আর এই ব্যঙ্গনধ্বনির লিখিত রূপই হচ্ছে ব্যঙ্গনবর্ণ। যেমন : ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, এও, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, ঙ়, এঁ, ঔঁ। ব্যঙ্গনবর্ণের সংখ্যা মোট ৩৯টি।

### স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ ও উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য

উচ্চারণের সময়ের তারতম্য অনুসারে স্বরধ্বনিগুলোকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন: ক. ত্রুত্বস্বর ও খ. দীর্ঘস্বর।

**ক. ত্রুত্বস্বর :** যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণে কম সময় লাগে, তাদেরকে ত্রুত্বস্বর বলে। অ, ই, ঈ, উ, ঊ ত্রুত্বস্বর।

**খ. দীর্ঘস্বর :** যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগে, তাদেরকে দীর্ঘস্বর বলে। আ, ঈ, উ, এ, ঐ, ঔ দীর্ঘস্বর।

### স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও বৈশিষ্ট্য

ধ্বনি	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থান অনুসারে নাম
অ, আ	কর্তৃ	কর্তৃধ্বনি
ই, ঈ	তালু	তালব্যধ্বনি
উ, ঊ	ঠোঁট বা ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্যধ্বনি
ঝ	মূর্ধা	মূর্ধন্যধ্বনি
এ, ঐ	কর্তৃ ও তালু	কর্তৃতালব্যধ্বনি
ও, ঔ	কর্তৃ ও ওষ্ঠ	কর্তোষ্ঠ্যধ্বনি

### ব্যঙ্গনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ ও উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য

উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যঙ্গনধ্বনি প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা :

### ক. স্পর্শধ্বনি

যেসব ব্যঙ্গনধ্বনির উচ্চারণে জিভ মুখের ভেতরে কঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ প্রভৃতি কোনো না কোনো স্থান স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদেরকে স্পর্শধ্বনি বলে। ক থেকে ম পর্যন্ত এই পঁচিশটি ধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি বলা হয়। এই স্পর্শধ্বনি পাঁচ রকমের হতে পারে। যেমন : কঠ্যব্যঙ্গন, তালব্যব্যঙ্গন, মূর্ধন্যব্যঙ্গন, দন্ত্যব্যঙ্গন ও ওষ্ঠ্যব্যঙ্গন।

### খ. অন্তঃস্থ ধ্বনি

য, য়, র, ল এবং অন্তঃস্থ-ব এই ধ্বনিগুলোর অবস্থান স্পর্শধ্বনি ও উচ্চধ্বনির মাঝামাঝি বলে এদেরকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলে।

### গ. উচ্চধ্বনি

যেসব ব্যঙ্গনধ্বনির উচ্চারণে ধ্বনিগুলোর রেশ টেনে রাখা যায়, তাদেরকে উচ্চধ্বনি বলে। শ, ষ, স, হ উচ্চধ্বনি। শ, ষ, স —এই তিনটি ধ্বনিকে শিস ধ্বনিও বলা হয়। কারণ শিস দেওয়ার সঙ্গে এ ধ্বনিগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে।

উচ্চারণস্থান অনুসারে স্পর্শধ্বনির পাঁচটি বিভাগ রয়েছে। মূলত কঠ, তালু, মূর্ধা, দাঁত ও ঠোঁট — এই পাঁচটি উচ্চারণস্থানের জন্য স্পর্শধ্বনিগুলোকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভাগগুলোকে বর্গ বলে। প্রথম ধ্বনির নাম অনুসারে বর্গের নাম নির্দেশ করা হয়। যেমন :

ক বর্গ	ক খ গ ঘ ঙ
চ বর্গ	চ ছ জ ঝ এও
ট বর্গ	ট ঠ ড ঢ ণ
ত বর্গ	ত থ দ ধ ন
প বর্গ	প ফ ব ভ ম

### ব্যঙ্গনধ্বনির উচ্চারণস্থান ও বৈশিষ্ট্য

ধ্বনি	উচ্চারণস্থান	উচ্চারণস্থান অনুসারে নাম
ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ	কঠ বা জিহ্বামূল	কঠ্য বা জিহ্বামূলীয় ধ্বনি
চ, ছ, জ, ঝ, এও, য়, শ	তালু	তালব্যধ্বনি
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ড়, ঢ়, ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্যধ্বনি
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দাঁত বা দন্ত	দন্ত্যধ্বনি
প, ফ, ব, ভ, ম	ঠোঁট বা ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্যধ্বনি

### **কষ্ট্যধ্বনি**

যেসব ধ্বনির উচ্চারণস্থান কষ্টনালির উপরিভাগ বা জিহ্বামূল, তাদের কষ্ট্যধ্বনি বলে। অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ কষ্ট্যধ্বনি।

### **তালব্যধ্বনি**

যেসব ধ্বনির উচ্চারণস্থান তালু, তাদের তালব্যধ্বনি বলে। ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, এও, য়, শ তালব্যধ্বনি।

### **মূর্ধন্যধ্বনি**

যেসব ধ্বনির উচ্চারণস্থান মূর্ধা বা তালুর অগ্রভাগ, তাদের মূর্ধন্যধ্বনি বলে। ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ড়, ঢ়, ষ মূর্ধন্যধ্বনি।

### **দস্ত্যধ্বনি**

যেসব ধ্বনির উচ্চারণস্থান দস্তমূল, তাদের দস্ত্যধ্বনি বলে। ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স দস্ত্যধ্বনি।

### **ওষ্ঠ্যধ্বনি**

যেসব ধ্বনির উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ, তাদের ওষ্ঠ্যধ্বনি বলে। উ, উঁ, প, ফ, ব, ভ, ম ওষ্ঠ্যধ্বনি।

### **কষ্ট্যতালব্যধ্বনি**

যেসব ধ্বনির উচ্চারণস্থান কষ্ট এবং তালু উভয়ই, তাদের কষ্ট্যতালব্যধ্বনি বলে। এ, ঐ কষ্ট্যতালব্যধ্বনি।

### **কঠোষ্ঠ্যধ্বনি**

যেসব ধ্বনির উচ্চারণস্থান কষ্ট ও ওষ্ঠ, তাদের কঠোষ্ঠ্যধ্বনি বলে। ও, উ কঠোষ্ঠ্যধ্বনি।

### **দস্তোষ্ঠ্যধ্বনি**

যেসব ধ্বনির উচ্চারণস্থান দস্ত এবং ওষ্ঠ, তাদের দস্তোষ্ঠ্যধ্বনি বলে। অন্তঃস্থ-ব দস্তোষ্ঠ্যধ্বনি।

### **স্পৃষ্টধ্বনি**

ক-বর্গ এবং প-বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিগুলোর উচ্চারণকালে মুখবিবরের বিশেষ স্থান স্পৃষ্ট হয় বলে এগুলোকে স্পৃষ্টধ্বনি বলে।

### **ঘৃষ্টধ্বনি**

চ, ছ, জ, ঝ —এই ধ্বনিগুলোর উচ্চারণকালে জিহ্বা বা তালুর স্পর্শের পর পরই উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষণজাত ধ্বনি সৃষ্টি হয় বলে এগুলোকে ঘৃষ্টধ্বনি বলে।

### **নাসিক্য বা অনুনাসিকধ্বনি**

ঙ, এও, ণ, ন, ম —এগুলোর উচ্চারণকালে মুখবিবরের বাতাস নাক দিয়ে বের হয় বলে এগুলোকে নাসিক্য বা অনুনাসিকধ্বনি বলে।

### **অঘোষধ্বনি**

প্রত্যেক বর্গের প্রথম দুটি ধ্বনি এবং শ, ষ, স এগুলোর উচ্চারণকালে আঘাতজনিত ঘোষ বা শব্দ সৃষ্টি হয় না বলে, এগুলোকে অঘোষধ্বনি বলে। এদেরকে শ্বাসধ্বনিও বলা হয়।

### ঘোষধ্বনি

বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি এবং হ এগুলোর উচ্চারণকালে আঘাতজনিত ঘোষ বা শব্দ সৃষ্টি হয় বলে, এগুলোকে ঘোষধ্বনি বলে। ঘোষধ্বনিকে নাদধ্বনিও বলা হয়।

### অল্পপ্রাণ ধ্বনি

প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম ধ্বনির উচ্চারণকালে বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে বলে এদের অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন : ক, গ, ঙ; চ, জ, এও ইত্যাদি।

### মহাপ্রাণ ধ্বনি

প্রত্যেক বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনির উচ্চারণকালে বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে বলে এদের মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন : খ, ঘ; ছ, ঝ ইত্যাদি।

ধ্বনি-প্রকৃতি	অল্পপ্রাণ ধ্বনি	মহাপ্রাণ ধ্বনি
অঘোষ	ক চ ট ত প	খ ছ ঠ থ ফ
ঘোষ	গ জ ড দ ব ঙ এও ণ ন ম	ঘ ঝ ব ঢ ধ ভ

### পরাশ্রয়ী ধ্বনি

‘ং’ (অনুস্থার), ‘ঃ’ (বিসর্গ) এবং ‘ঽ’ (চন্দ্ৰবিন্দু) এই ধ্বনি তিনটি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হতে পারে না বলে এদের পরাশ্রয়ী ধ্বনি বলে। এদের অযোগবহু ধ্বনিও বলে।

### অ্যা ধ্বনির উচ্চারণ

উচ্চারণ একটি বাচনিক প্রক্রিয়া। ভাষায় উচ্চারণের শুন্দতা রক্ষিত না হলে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। মনের ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা। দুভাবে ধ্বনি বা ভাষাকে প্রকাশ করা যায়। এক মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে; দুই লিখে। মনের ভাব লিখে কিংবা উচ্চারণ করে যেভাবেই প্রকাশ করা হোক না কেন, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথার্থ বানান ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ অপরিহার্য। শুন্দ উচ্চারণ সঠিক মনোভাব প্রকাশের সহায়ক। পক্ষান্তরে, অশুন্দ উচ্চারণ শব্দের অর্থবিজ্ঞানি ও বিকৃতি ঘটায়। তাই শুন্দ উচ্চারণের শুরুত্ব অপরিসীম। শুন্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রমিত কথ্য ভাষার বাচনভঙ্গির অনুসরণ প্রয়োজন। সেই সাথে স্বরধ্বনি ও ব্যঙ্গনধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা আবশ্যিক। এ ছাড়াও ভাষা ব্যবহারে আঞ্চলিকতা পরিহার করা এবং উচ্চারণসূত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা আর্জন করা দরকার।

মনে রাখা প্রয়োজন প্রতিটি ধ্বনি-প্রতীকের নিজস্ব উচ্চারণ ও ধ্বনিগামীর্য রয়েছে। উল্লেখ্য, একাধিক ধ্বনি মিলে যখন শব্দ তৈরি হয়, তখন ধ্বনি-প্রতীকের উচ্চারণ কোথাও অপরিবর্তিত থাকে আবার কোথাও পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়ে যায়। নিচে অ্যা ধ্বনির উচ্চারণরীতি উল্লেখ করা হলো।

বাংলা বর্ণমালায় বর্তমানে ব্যবহৃত স্বরধ্বনির সংখ্যা ১১টি। এগুলো হলো : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, খ, এ, ঐ, ও, ঔ।

প্রমিত বাংলা উচ্চারণে মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ৭টি। এগুলো হলো : ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ। বাংলা মুখের ভাষায় স্বরধ্বনি অ্যা-ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও এই বর্গের জন্য পৃথক কোনো বর্ণচিহ্ন বাংলা বর্ণমালায় নেই।

### অ্যা ধ্বনির উচ্চারণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ‘অ্যা’ ধ্বনির কোনো স্বতন্ত্র ধ্বনি-চিহ্ন নেই। কয়েকটি ক্ষেত্রে আ ধ্বনির উচ্চারণ অ্যা হয়।

১. শব্দের শুরুতে যুক্ত ব্যঙ্গনের জ্ঞ আ-কার থাকলে : জ্ঞাত [গ্যাতো] জ্ঞান [গ্যান/গ্যান] জ্ঞাপন [গ্যাপন]।

২. য-ফলা যুক্ত ব্যঙ্গনের সঙ্গে আ-কার বা আ-ধ্বনির উচ্চারণ প্রায় ক্ষেত্রেই অ্যা হয়। যেমন :

খ্যাতি [খ্যাতি]      ব্যাপার [ব্যাপার]

ত্যাগ [ত্যাগ]      ব্যাকরণ [ব্যাকরোন্]

লক্ষণীয় শব্দের মধ্যে জ্ঞ থাকলে আ-ধ্বনি কখনো অ্যা, কখনো আ উচ্চারিত হয়। যেমন : বিজ্ঞান [বিগ্যান/বিগ্নান]

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

১। ব্যঙ্গন বর্ণের সংখ্যা কয়টি ?

- |          |          |
|----------|----------|
| ক. ১১ টি | খ. ২৫ টি |
| গ. ৩৯ টি | ঘ. ৫০ টি |

২। নিচের কোন বর্ণগুলো কর্তৃধ্বনির উদাহরণ ?

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ক. অ, আ, ক, খ | খ. ই, ঈ, চ, ছ |
| গ. উ, ঊ, প, ফ | ঘ. ত, থ, দ, ধ |

### কর্ম-অনুশীলন

নিচের ব্যঙ্গনধ্বনির উচ্চারণস্থান ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

ধ্বনি	উচ্চারণস্থান	উচ্চারণস্থান অনুসারে নাম
ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ		
চ, ছ, জ, ঝ, এও, য়, শ		
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ড়, ঢ়, ষ		
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স		
প, ফ, ব, ভ, ম		

## ৪. সংক্ষি

নিচের বাক্যটি লক্ষ কর—

গ্রাম-বাংলায় এখন চাষিদের ঘরে ঘরে নবান্ন ।

উপরের বাক্যের ‘নবান্ন’ শব্দটি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে পাশাপাশি অবস্থিত ‘নব’ এবং ‘অন্ন’ এ দুটি শব্দ দ্রুত উচ্চারণের ফলে তৈরি হয়েছে ‘নবান্ন’ শব্দটি । এ ক্ষেত্রে ‘নব’ শব্দের শেষে নিহিত ‘অ’ ধ্বনি এবং ‘অন্ন’ শব্দের প্রথমে অবস্থিত ‘অ’ ধ্বনি উভয়ে মিলে ‘আ’ ধ্বনি হয়েছে । যেমন :

নব + অন্ন = নবান্ন । (অ + অ = আ)

লক্ষণীয় যে আমরা যখন কথা বলি, তখন অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত উচ্চারণের ফলে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি শব্দের ধ্বনি মিলে এক হয়ে যায় কিংবা একটি ধ্বনির প্রভাবে অন্য ধ্বনি বদলে যায় বা লোপ পায় । দ্রুত উচ্চারণের ফলে পাশাপাশি অবস্থিত ধ্বনির এই মিলন, পরিবর্তন বা বিলোপই সংক্ষি নামে পরিচিত ।

বস্তুত, ‘সংক্ষি’ শব্দের অর্থ মিলন । এটি ধ্বনি পরিবর্তনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া—ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির মিলনজাত প্রক্রিয়া ।

সংক্ষি বা ধ্বনির মিলন নানাভাবে হতে পারে । যেমন :

১. দুটি ধ্বনির আংশিক বা পূর্ণমিলন । যেমন : শত + অধিক = শতাধিক [অ + অ = আ]

২. পূর্বধ্বনি বা পরধ্বনি লোপ । যেমন : নিঃ + চয় = নিচয় [ঃ + চ = চ]

সংজ্ঞা : পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সংক্ষি বলে ।

অথবা, পরস্পর সন্তুষ্টি দ্রুত ধ্বনির মিলন, পরিবর্তন বা বিলুপ্তিকে সংক্ষি বলে ।

— ডষ্টের মুহূর্মদ এনামুল হকের মতে, একাধিক ধ্বনির মিলন, লোপ বা পরিবর্তনের নাম সংক্ষি ।

### সংক্ষির প্রয়োজনীয়তা

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনি দ্রুত উচ্চারণের সময় সংক্ষির ফলে উচ্চারণে স্বাচ্ছন্দ্য আসে এবং উচ্চারণ সহজতর হয় । সংক্ষি ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করে । যেমন : ‘নব’ ‘অন্ন’ উচ্চারণে যে সময় প্রয়োজন—‘নবান্ন’ উচ্চারণে তার চেয়ে কম সময় লাগে । এ ছাড়া ‘নব’ ‘অন্ন’ বলতে যে ধরনের উচ্চারণ-শ্রম প্রয়োজন, ‘নবান্ন’ তার চেয়ে সহজে উচ্চারিত হয় । কেবল তা-ই নয়—আলাদাভাবে ‘নব’ ‘অন্ন’ উচ্চারণের চেয়ে একসঙ্গে ‘নবান্ন’ উচ্চারণ অনেক বেশি শ্রতিমধুর । অর্থাৎ সংক্ষি ভাষার ধ্বনিগত মাধুর্যও সম্পাদন করে । সংক্ষির ফলে নতুন নতুন শব্দও তৈরি হয় । শুন্দ বানান লিখতেও সংক্ষি সহায়তা করে । সুতরাং উল্লিখিত দিকগুলো বিবেচনায় বাংলা ভাষায় সংক্ষির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ।

### সংক্ষির প্রকারভেদ

সংক্ষি দুই প্রকার । যথা : ১. স্বরসংক্ষি ও ২. ব্যঞ্জনসংক্ষি ।

১. স্বরসংক্ষি : স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে যে সংক্ষি হয়, তাকে স্বরসংক্ষি বলে। যেমন :

নব + অন্ন = নবান্ন      অ + অ = আ

হিম + আলয় = হিমালয়      অ + আ = আ

২. ব্যঞ্জনসংক্ষি : স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির, ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনে যে সংক্ষি হয়, তাকে ব্যঞ্জনসংক্ষি বলে। যেমন :

উৎ + চারণ = উচ্চারণ      (ত্ + চ = চ্ছ)

সৎ + জন = সজ্জন      (ত্ + জ = জ্জ)

বিসর্গসংক্ষি : বিসর্গসংক্ষি বলে ব্যঞ্জনসংক্ষির একটি প্রকারভেদ আছে। বিসর্গ (ঃ) হচ্ছে ‘র’ এবং ‘স’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিসর্গের সঙ্গে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনকে বিসর্গসংক্ষি বলে। যেমন :

আবিঃ + কার = আবিক্ষার      [ঃ + ক = ক্ষ]

কখনো কখনো বিসর্গসংক্ষিকে ভিন্ন একটি শ্রেণিতে ফেলে সংক্ষিকে তিনি প্রকার বলা হয়। যেহেতু ‘ঃ’ (বিসর্গ) ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্গত, সেহেতু বিসর্গসংক্ষি ব্যঞ্জনসংক্ষিরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলা ভাষায় নানা জাতের শব্দ রয়েছে। শব্দের উৎস বিচারে সংক্ষিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

ক. তৎসম বা সংস্কৃতাগত সংক্ষি;

খ. খাঁটি বাংলা সংক্ষি।

ক. তৎসম বা সংস্কৃতাগত সংক্ষি : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের সংক্ষি হলে তাকে তৎসম বা সংস্কৃতাগত সংক্ষি বলে। তৎসম সংক্ষি স্বর ও ব্যঞ্জনভেদে দুই প্রকার :

১. তৎসম বা সংস্কৃতাগত স্বরসংক্ষি

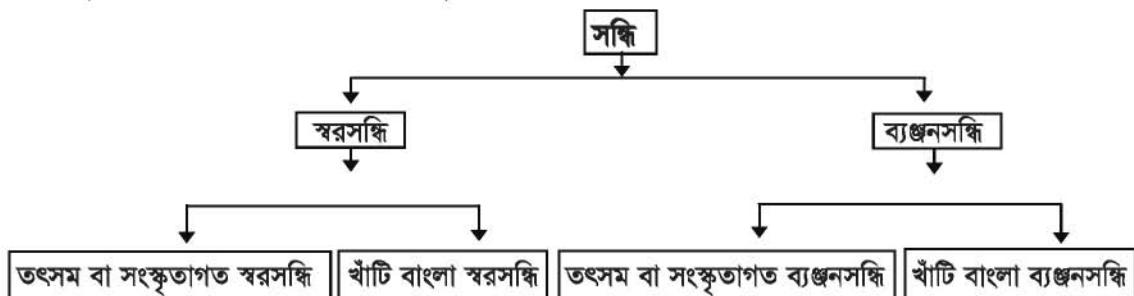
২. তৎসম বা সংস্কৃতাগত ব্যঞ্জনসংক্ষি।

খ. খাঁটি বাংলা সংক্ষি : খাঁটি বা চলিত বাংলা শব্দ পাশাপাশি উচ্চারণের সময় যে সংক্ষি হয়, তাকে খাঁটি বাংলা সংক্ষি বলা হয়। তবে খাঁটি বাংলা সংক্ষির নিয়ম সংস্কৃত সংক্ষির সঙ্গে মেলে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তৎসম সংক্ষির নিয়ম প্রয়োগ করে ভিন্ন নিয়মে এ সংক্ষি করা হয়। যেমন : পাঁচ + সের = পাঁশসের, কাঁচা + কলা = কাঁচকলা। মূলত এ ধরণের সংক্ষি খাঁটি বাংলা সংক্ষি। খাঁটি বাংলা সংক্ষি দুই প্রকার। যথা :

১. খাঁটি বাংলা স্বরসংক্ষি;

২. খাঁটি বাংলা ব্যঞ্জনসংক্ষি।

নিচে ছকাকারে সন্ধির বিভাজন দেখানো হলো :



### ব্যঞ্জনসন্ধি : নিয়ম ও উদাহরণ

নিচে কেবল তৎসম বা সংকৃতাগত ব্যঞ্জনসন্ধির উল্লেখযোগ্য কয়টি সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

#### তৎসম বা সংকৃতাগত ব্যঞ্জনসন্ধি

##### ব্যঞ্জনে-স্বরে সন্ধি

নিয়ম-১ : বর্গের প্রথম ব্যঞ্জনের (ক / চ / ট / ত / প) পরে স্বরধনি থাকলে বর্গের প্রথম ব্যঞ্জনহলে তৃতীয় ব্যঞ্জন (গ / জ / ড / দ / ব) হয়। যেমন :

$$\text{ক} + \text{স্বরধনি} = \text{গ} + \text{স্বরধনি} : \quad \text{দিক} + \text{অন্ত} = \text{দিগন্ত}।$$

$$\text{বাক} + \text{অর্থ} = \text{বাগর্থ}।$$

$$\text{প্রাক} + \text{উক্ত} = \text{প্রাণুক্ত}।$$

$$\text{বাক} + \text{ঈশ} = \text{বাগীশ}।$$

$$\text{চ} + \text{স্বরধনি} = \text{জ} + \text{স্বরধনি} : \quad \text{গিচ} + \text{অন্ত} = \text{গিজন্ত।}$$

$$\text{অচ} + \text{অন্তা} = \text{অজন্তা।}$$

$$\text{ট} + \text{স্বরধনি} = \text{ড} (\text{ড}) + \text{স্বরধনি} : \quad \text{ষট} + \text{আনন} = \text{ষড়ানন।}$$

$$\text{ষট} + \text{খতু} = \text{ষড়খতু।}$$

$$\text{ত} + \text{স্বরধনি} = \text{দ} + \text{স্বরধনি} : \quad \text{তৎ} + \text{অন্ত} = \text{তদন্ত।}$$

$$\text{কৃৎ} + \text{অন্ত} = \text{কৃদন্ত।}$$

$$\text{সৎ} + \text{ইচ্ছা} = \text{সদিচ্ছা।}$$

$$\text{প} + \text{স্বরধনি} = \text{বৃ} + \text{স্বরধনি} : \quad \text{সুপ} + \text{অন্ত} = \text{সুবন্ত।}$$

### স্বরে-ব্যঞ্জনে সঙ্গি

নিয়ম-২ : স্বরধ্বনির পরে ছ থাকলে ছ হালে ছ হয়। যেমন :

অ + ছ = অছ	এক + ছত্র = একচ্ছত্র।	স্ব + ছন্দ = স্বচ্ছন্দ।
অঙ্গ+ছেদ = অঙ্গছেদ।		প্র + ছদ = প্রচ্ছদ।
মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি।		বৃক্ষ+ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া।
আ + ছ = আছু	আ + ছন্দ = আচ্ছন্দ।	কথা + ছলে = কথাচ্ছলে।
	আ + ছান্দ = আচ্ছান্দ।	পরীক্ষা + ছলে = পরীক্ষাচ্ছলে।
ই + ছ = ইচ্ছ	পরি + ছদ = পরিছদ।	প্রতি + ছবি = প্রতিছবি।
	পরি + ছন্দ = পরিচ্ছন্দ।	

### ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে সঙ্গি

নিয়ম-৩ : ত [ঢ] কিংবা দ্-এর পরে ছ কিংবা ছ থাকলে ত বা দ্ হালে ছ হয়। যেমন :

ত + ছ = ত্ছ	উৎ + চারণ = উচ্চারণ।	চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র।
দ্ + ছ = দ্ছ	বিপদ্ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা।	তদ্ + চিত্র = তচ্চিত্র।
ত + ছ = ত্ছ	উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।	চলৎ + ছবি = চলচ্ছবি।
দ্ + ছ = দ্ছ	তদ্ + ছবি = তচ্ছবি।	উদ্ + ছেদ = উচ্ছেদ।

নিয়ম-৪ : ত [ঢ] কিংবা দ্ -এর পরে জ্ কিংবা ঝ্ থাকলে সঙ্গিতে দুয়ে মিলে জ্জ বা ঝ্ঝ হয়। যেমন :

ত + জ্ = জ্জ	উৎ + জীবন = উজ্জীবন।	উৎ + ঝুল = উজ্জুল।
	সৎ + জন = সজ্জন।	তৎ + জন্য = তজ্জন্য।

অনুবূগ : উজ্জীবিত, যাবজ্জীবন, কজ্জল, জগজ্জীবন।

দ্ + জ্ = জ্জ	বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক।
	তদ্ + জাতীয় = তজ্জাতীয়।
ত + ঝ্ = ঝ্ঝ	কুৎ + ঝটিকা = কুঝ্ঝটিকা।

নিয়ম-৫ : ত [ঢ] কিংবা দ্ -এর পরে ড্ কিংবা ছ থাকলে ত বা দ্ হালে ড্ হয়। যেমন :

ত + ড্ = ডড	উৎ + ডীন = উড্ডীন।	উৎ + ডীয়মান = উড্ডীয়মান।
দ্ + ছ = ড্ছ	এতদ্ + ছক্ষা = এতড্ছক্ষা।	

নিয়ম-৭ : ত [ঁ] কিংবা দ -এর পরে ন থাকলে সঞ্চিতে দুয়ে মিলে ন হয়। যেমন :

ত + ন = ন্ত      উৎ + নত = উন্নত ।      উৎ + নয়ন = উন্নয়ন ।

নিয়ম-৮ : ত [ঁ] কিংবা দ-এর পরে ম থাকলে সঞ্চিতে ত বা দ-এর স্থানে ন হয়। যেমন :

ত + ম = ন্ম      মৃৎ + ময় = মৃন্ময় ।      ঈষৎ + মাত্র = ঈষন্মাত্র ।

দ + ম = ন্ম      তদ + মধ্যে = তন্মধ্যে ।

নিয়ম-৯ : ত [ঁ] কিংবা দ-এর পরে ল থাকলে সঞ্চিতে দুয়ে মিলে ল্ত হয়। যেমন :

ত + ল = ল্ত      উৎ + লাস = উল্লাস ।      উৎ + লেখ = উল্লেখ ।

দ + ল = ল্ত      তদ + লিখিত = তল্লিখিত ।      সম্পদ + লাভ = সম্পল্লাভ ।

নিয়ম-১০ : ত [ঁ] কিংবা দ -এর পরে শ থাকলে ত ও দ স্থানে ছ এবং শ স্থানে ছ হয় এবং দুয়ে মিলে ছ্ছ হয়। যেমন :

ত + শ = ছ      উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস ।      উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল ।      উৎ + শল = উচ্ছল

নিয়ম-১১ : ত [ঁ] কিংবা দ -এর পরে হ থাকলে ত ও দ স্থানে দ হয় এবং হ স্থানে থ হয় এবং দুয়ে মিলে ঢ্ড (দ + থ) হয়। যেমন :

ত + হ = দ + থ = ঢ উৎ + হার = উঢ়ার ।      উৎ + হত = উঢ়ত উৎ + দত = উঢ্ডত ।

দ + হ = ঢ      তদ + হিত = তক্ষিত ।      পদ + হতি = পক্ষতি ।

নিয়ম-১২ : ন কিংবা ম পরে থাকলে বর্গের প্রথম ধ্বনি সঞ্চিতে পঞ্চম ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন :

ক > ঙ      দিক + নির্ণয় = দিঙ্গনির্ণয় ।      বাক + ময় = বাঙ্ময় ।

ট > ন      ঘট + মাস = ঘন্মাস ।

ত > ন      উৎ + নয়ন = উন্ময়ন ।      চিৎ + ময় = চিন্ময় ।      মৃৎ + ময় = মৃন্ময় ।

নিয়ম-১৩ : আগে ম এবং পরে ক / খ / গ / ঘ -এর যেকোনোটি থাকলে সঞ্চিতে ম স্থানে অনুস্বার (ঁ) বা উয়ো (ঙ) হয়। যেমন :

ম + ক = ঁক / ঙ ক

অলম + কার = অলংকার/ অলঙ্কার ।      অহম + কার = অহংকার/অহঙ্কার ।

সম + কলন = সংকলন/ সঞ্জলন ।      সম + কীর্ণ = সংকীর্ণ /সঙ্কীর্ণ ।

ম + গ = ঁগ / ঙ গ

সম + গত = সংগত/ সঙ্গত ।

সম + গীত = সংগীত/ সঙ্গীত ।

ম + ঘ = ঁঘ / ঙ ঘ

সম + ঘ = সংঘ / সঙ্ঘ ।

সম + ঘাত = সংঘাত /সঙ্ঘাত ।

নিয়ম-১৪ : আগে মু এবং পরে চ থেকে মু পর্যন্ত বর্গীয় ধ্বনির যেকোনোটি থাকলে পূর্বপদের মু স্থানে পরবর্তী বর্গীয় ধ্বনির পঞ্চম ধ্বনি হয়। যেমন :

ম + চ = খ	সম + চয় = সঞ্চয়।	কিম + চিৎ = কিঞ্চিত।
ম + ত = ষ্ট	সম + তাপ = সংতাপ।	সম + ত্রাস = সংত্রাস।
	গম + তব্য = গত্বব্য।	কিম + তু = কিষ্ট।
ম + দ = ন্দ	সম + দর্শন = সংদর্শন।	
ম + ধ = ঙ্ক	সম + ধান = সংঙ্কান।	সম + ধি = সংঙ্কি।
ম + ল = ন্ল	সম + নিহিত = সংনিহিত।	সম + নিবেশ = সংনিবেশ।
	কিম + নর = কিন্নুর।	সম + ন্যাস = সংন্যাস।
ম + প = স্প	সম + পদ = সংস্পদ।	সম + প্রীতি = সংস্প্রীতি
	সম + প্রতি = সংস্প্রতি।	সম + পূর্ণ = সংস্পূর্ণ। সম + পূরক = সংস্পূরক।
ম + ব = ষ্ব	সম + বল = সংস্বল।	সম + বোধন = সংস্বোধন।

জ্ঞাতব্য : কখনো কখনো মু -এর পরে বু থাকলে মু স্থানে ১ হয়। যেমন :

ম + বু = ১	সম + বাদ = সংবাদ।	সম + বিৎ = সংবিত।	সম + বরণ = সংবরণ।
	সম + বিধান = সংবিধান।	সম + বর্ধনা = সংবর্ধনা।	কিম + বা = কিংবা।

নিয়ম-১৫ : আগে মু এবং পরে অন্তঃস্থ ব্যঞ্জন (য/ৱ/ল/ব) কিংবা উচ্চধ্বনির (শ/ সু /হ) যেকোনোটি থাকলে পূর্বপদের মু স্থানে ১ (অনুস্মার) হয়। যেমন :

ম + য = য্য	সম + যত = সংযত।	সম + যুক্ত = সংযুক্ত।
ম + রু = র্ব	সম + রক্ষণ = সংরক্ষণ।	সম + রক্ষিত = সংরক্ষিত।
ম + লু = ল্ব	সম + লাপ = সংলাপ।	সম + লগ্ন = সংলগ্ন।
ম + বু = ব্ব	সম + বরণ = সংবরণ।	সম + বর্ধনা = সংবর্ধনা।
	সম + বাদ = সংবাদ।	সম + বিধান = সংবিধান।
ম + শু = শ্ব	সম + শয় = সংশয়।	সম + শ্লেষ = সংশ্লেষ।
	সম + শোধন = সংশোধন।	সম + শ্লিষ্ট = সংশ্লিষ্ট।
ম + সু = স্ব	সম + সার = সংসার।	সৰ্বম + সহা = সৰ্বসহা।
ম + হু = হ্ব	সম + হত = সংহত।	সম + হার = সংহার।
	সম + হতি = সংহতি।	সম + হিতা = সংহিতা।

নিয়ম-১৬ : চ বর্গের ধ্বনির পরে ন् থাকলে সঙ্গিতে ন-এর স্থলে এও হয়। যেমন :

চ + ন = চঞ্চ      যাচ + না = যাঞ্চা।

জ + ন = জঞ্চ      রাজ + নী = রাঞ্চী।

নিয়ম-১৭ : শ্ব-এর পরে ত্ কিংবা থ্ থাকলে ত-এর স্থলে ট্ এবং থ্-এর স্থলে ঠ্ হয়। যেমন :

শ্ব + ত = ত > ট      নশ্ব + ত = নষ্ট      বশ্ব + তি = বঢ়ি।

সৃজ্জ + তি = সৃষ্টি।      কৃশ্ব + তি = কৃষ্টি।

শ্ব + থ = থ > ঠ      ষশ্ব + থ = ষষ্ঠ।

নিয়ম-১৮ : শ্ব-এর পরে কৃ ধাতু নিষ্পত্তি ‘কৃত’, ‘কার’, ‘করণ’, ‘কৃতি’ ইত্যাদি শব্দ থাকলে শ্ব স্থানে ৎ হয়, এবং সৃ ধ্বনির আগম হয়। যেমন :

শ্ব + কৃত = ৎ + সৃ      সম্ব + কৃত = সংকৃত।

শ্ব + কার = ৎ + সৃ      সম্ব + কার = সংক্ষার।

শ্ব + করণ = ৎ + সৃ      সম্ব + করণ = সংক্ষরণ।

শ্ব + কৃতি = ৎ + সৃ      সম্ব + কৃতি = সংকৃতি।

নিয়ম-১৯ : উঅবৰ্ণ (শ স হ) পরে থাকলে পূর্বপদের শেষে অবস্থিত ন্ ধ্বনি ৎ-এ পরিবর্তিত হয়। যেমন:

ন্ + সৃ = ৎ      হিন্ব + সা = হিংসা।      দন্ব + শন = দংশন।

সিন্ব + হ = সিংহ।

### ব্যঙ্গনসংক্ষিপ্তিত শব্দের উদাহরণ

#### ব্যঙ্গনসংক্ষি

অনুচ্ছেদ = অনু + ছেদ।

অহংকার = অহম্ + কার।

উল্লাস = উৎ + লাস।

উদ্ধার = উৎ + হার।

উচ্চারণ = উৎ + চারণ।

উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল।

উচ্ছাস = উৎ + শ্বাস।

উচ্চুজ্জ্বল = উৎ + শৃজ্জ্বল।

উল্লেখ = উৎ + লেখ।

উদ্ঘাটন = উৎ + ঘাটন।

উদ্যোগ = উৎ + যোগ।

উদ্যম = উৎ + দম।

উন্নত = উৎ + নত।

উন্নয়ন = উৎ + নয়ন।

কৃষ্টি = কৃশ্ব + তি।

কুজ্ঞাটিকা = কুৎ + ঝটিকা।

চলচ্ছবি = চলৎ + ছবি।

চিন্ময় = চিৎ + ময়।

জগদীশ = জগৎ + ঈশ।

জগন্মাথ = জগৎ + নাথ।

জগন্ময় = জগৎ + ময়।

গিজন্ত = গিচ + অন্ত।	তৎকাল = তদ্ + কাল।	তৎসম = তদ্ + সম।
তদ্দিত = তদ্ + হিত।	তন্মধ্যে = তৎ + মধ্যে।	দিগন্ত = দিক্ + অন্ত।
দিগৃগজ = দিক্ + গজ।	দুলোক = দিব + লোক।	পরিছন্দ = পরি + ছন্দ।
পদ্ধতি = পদ্ + হতি।	প্রতিছবি = প্রতি + ছবি।	পরিচেন্দ = পরি + ছেন্দ।
বাঞ্চয় = বাক্ + যয়।	বনস্পতি = বন + পতি।	মৃন্যায় = মৃৎ + যয়।
যাচ্ছেণ্টা = যাচ্ + না।	রাজ্জী = রাজ্ + নী।	ষষ্ঠি = ষষ্ঠ্ + থ।
ষড়খাতু = ষট্ + খাতু।	ষড়যন্ত্র = ষট্ + যন্ত্র।	ষণ্মাস = ষট্ + মাস।
যোড়শ = ষট্ + দশ।	সচরিত্র = সৎ + চরিত্র।	সংজ্ঞন = সৎ + জন।
সংথওয় = সম্ + চয়।	সংবাদ = সম্ + বাদ।	সংগীত = সম্ + গীত।

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

১। নিচের কোনটি সঠিক সংক্ষি ?

- ক. রাজা + নী = রাজ্জী  
গ. সিং + হ = সিংহ

- খ. বৃষ + তি = বৃষ্টি  
ঘ. উথ + লাস = উল্লাস

১। সংক্ষি শব্দের অর্থ-

- ক. সংযোগ  
গ. মিলন

- খ. সমাধান  
ঘ. শান্তি

### কর্ম-অনুশীলন

১। সংক্ষির সংজ্ঞা এবং সংক্ষির প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন প্রকার সংক্ষির পরিচয় একটি পোস্টার পেপারে সুন্দর করে সাজিয়ে লেখ।

২। ছক অনুযায়ী নিচের শব্দগুলোর সক্ষি বিশ্লেষণ কর এবং সক্ষির নিয়ম লেখ :

শব্দ	সক্ষি-বিশ্লেষণ	সক্ষির নিয়ম
নবান্ন		
শুভেচ্ছা		
দেবেন্দ্র		
নীলোৎপল		
মহোৎসব		
শীতার্ত		
হিতৈষী		
ইত্যাদি		

## ৫. শব্দ ও পদ

### কারক ও বিভক্তি

বাংলা ব্যাকরণে ‘কারক’ একটি সুপরিচিত প্রসঙ্গ। ‘কার’ করে। বাক্যে কর্তৃই ক্রিয়া সম্পাদন করে। সুতরাং কর্তৃই কারক এ রকম মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাকরণে শুধু কর্তৃই কারক নয়। কর্তা কী করছে, কার সাহায্যে করছে, কোথায় করছে অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনের অবলম্বন, উপকরণ, হেতু, স্থান, কাল ইত্যাদি সবকিছুই এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য। ক্রিয়া সম্পাদনে ক্রিয়ার সঙ্গে ঐ সব ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল ইত্যাদির যে সম্পর্ক রয়েছে, ব্যাকরণে তা কারক নামে অভিহিত।

### কারকের সংজ্ঞার্থ

বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে।

### কারকের প্রকারভেদ

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের ছয় প্রকারের সম্পর্ক হয়ে থাকে। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে কারক ছয় প্রকার। যেমন :

- |                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| ১. কর্তৃকারক,      | ২. কর্মকারক,     | ৩. করণ কারক,   |
| ৪. সম্প্রদান কারক, | ৫. অপাদান কারক ও | ৬. অধিকরণ কারক |

নিচে একটি বাক্যের সাহায্যে এই সম্পর্কের সূত্রসমূহ দেখানো হলো :

‘বাদশা নাসির উদ্দিন প্রত্যহ সকালে রাজকোষ হতে স্বহস্তে দরিদ্রদেরকে ধন দান করতেন।’

১. কে দান করতেন ? বাদশা নাসির উদ্দিন (কর্তৃকারক)
২. কী দান করতেন? ধন (কর্মকারক)
৩. কী দ্বারা দান করতেন? স্বহস্তে (করণ কারক)
৪. কাদের দান করতেন? দরিদ্রদের (সম্প্রদান কারক)
৫. কোথা হতে দান করতেন? রাজকোষ হতে (অপাদান কারক)
৬. কখন দান করতেন? প্রত্যহ সকালে (অধিকরণ কারক)

### কারক নির্ণয়ের প্রশ্নোভ্যুম পদ্ধতি

১. ক্রিয়াকে ‘কে’ দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে কর্তৃকারক।
২. ক্রিয়াকে ‘কী’ বা ‘কাকে’ দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে কর্মকারক।
৩. ক্রিয়াকে ‘কী দ্বারা’ প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে করণ কারক।
৪. ক্রিয়াকে ‘কাকে’ (স্বত্ত্বাত্যাগ করে প্রদান) দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে সম্প্রদান কারক।

৫. ক্রিয়াকে ‘কোথা হতে’ প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে অপাদান কারক।

৬. ক্রিয়াকে ‘কোথায়’, ‘কখন’ দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যাবে অধিকরণ কারক।

### বিভক্তি

বাক্যের শব্দগুলোর নির্দিষ্ট বিন্যাস থাকে। বিন্যাসই সমগ্র বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করে দেয়। দেখা যায়, বাক্যের যথাযথ অর্থ জ্ঞাপনের জন্য বাক্যস্থিত নাম শব্দগুলোর সঙ্গে কখনো কখনো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে থাকে। এই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির নাম বিভক্তি। বাংলা বাক্যের পদগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কারক নির্দেশের জন্য এই বিভক্তিগুলোর সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অনেক সময় বিভক্তির প্রয়োজন পড়ে না। বিভক্তি না থাকলে শূন্য বিভক্তি (০) ধরে নিতে হয়। যেমন :

সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে।

এই বাক্যে তিনটি নাম শব্দ আছে সন্ধ্যা, আকাশ, চাঁদ। আর ‘উঠেছে’ হলো ক্রিয়াপদ। সমগ্র বাক্যটির অর্থগ্রাহ্যতার জন্য ‘সন্ধ্যা’ শব্দের সঙ্গে ‘য়’, ‘আকাশ’ শব্দের সঙ্গে ‘এ’ যুক্ত হয়েছে। ‘য়’, ‘এ’ হলো বিভক্তি। চাঁদ-এর সঙ্গে কোনো বর্ণ যুক্ত হয়নি প্রয়োজন নেই বলে। কিন্তু ব্যাকরণমতে, সেখানেও বিভক্তি আছে, তবে তা শূন্য (০) বিভক্তি। শূন্য (০) বিভক্তিকে অ-বিভক্তিও বলা হয়। সমগ্র বাক্যটির বিন্যাস এই রকম :

সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে।

সন্ধ্যা+য় আকাশ+এ চাঁদ+০ উঠেছে।

এই বাক্যের বিভক্ত অংশগুলোই (য়, এ, ০) বিভক্তি।

### সংজ্ঞার্থ

বাক্যে ব্যবহৃত যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি বাক্যের অর্থগ্রাহ্যতায় সাহায্য করে, তাদের বিভক্তি বলা হয়।

### বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা

বাংলায় এমন অনেক বাক্য রয়েছে, যেগুলোতে ক্রিয়াপদ নেই। যেমন :

মাঠে মাঠে অজস্র ফসল।

ছোট ছোট ডিঙি নৌকাগুলো নদীতে ভাসমান।

এ জাতীয় ক্রিয়াইন অনেক বাক্য বাংলায় রয়েছে। ক্রিয়া নেই বলে এই বাক্যগুলোর অন্তর্গত নাম শব্দগুলোর কারকও নেই। সে জন্য বলা হয় বাংলা বাক্য কারক-প্রধান নয়। কিন্তু বিভক্তি ছাড়া বাংলা বাক্য ঠিকভাবে গঠিত হতে পারে না এবং বাক্যও অর্থগ্রাহ্য হয় না। ওপরের দুটি বাক্যের বিভক্তি তুলে নিলে বাক্যগুলো যথাযথ অর্থ প্রকাশ করবে না। ‘মাঠ মাঠ অজস্র ফসল’ কিংবা ‘ছোট ছোট ডিঙি নৌকা নদী ভাসমান’ বাক্য হিসেবে ত্রুটিগূর্ণ। প্রথম বাক্যে ‘এ’ বিভক্তি (মাঠ+এ), দ্বিতীয় বাক্যে ‘তে’ বিভক্তি (নদী+তে) বাক্য দুটির বিন্যাস ও অর্থ ঠিক করে দিয়েছে। ‘গাছের পাতায় রাতের শিশির লেগে আছে’ —এই বাক্যেও আমরা দেখছি এর বিভক্তি [গাছ+এর, রাত+এর] ও ‘য়’ বিভক্তি [পাতা+য়] বাক্যটিকে সম্পূর্ণ অর্থগ্রাহ্য

করেছে। নতুবা ‘গাছ পাতা রাত শিশির’ কোনো বাক্য নয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বিভক্তি বাক্যের অন্তর্গত শব্দ অর্থাৎ পদগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং বাক্যের অর্থ নির্দিষ্ট করে। সে জন্য বাংলা বাক্য বিভক্তি-প্রধান। এর থেকে বাংলা বাক্যে বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। অবশ্য সব সময় বিভক্তি দিয়ে বাংলা ভাষা ভাব প্রকাশ করতে পারে না, সেসব ক্ষেত্রে বিভক্তির স্থানে বিভক্তি-স্থানীয় কিছু শব্দ যেমন ‘ঘারা’, ‘দিয়ে’, ‘কর্তৃক’, ‘হতে’, ‘থেকে’, ‘চেয়ে’ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

### বিভক্তির প্রকারভেদ

বিভক্তি দুই প্রকার। যথা :

১. শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি ও ২. ক্রিয়া বিভক্তি।

#### ১. শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি

শব্দ বা নাম পদের সঙ্গে যেসব বিভক্তি যুক্ত হয়, তাদেরকে শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি বলে। যেমন :

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। (ভিক্ষুক + কে)

#### ২. ক্রিয়া বিভক্তি

ধাতু বা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যেসব বিভক্তি যুক্ত হয়, তাদেরকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে। যেমন :

তিনি বাড়ি যাবেন (যা + ইবেন = যাইবেন/ যা + বেন = যাবেন)।

শব্দ বিভক্তির সঙ্গে কারকের এবং ক্রিয়া বিভক্তির সঙ্গে কাল ও পুরুষের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে।

শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি কারক নির্দেশ করে বলে এগুলোকে কারক বিভক্তিও বলা হয়। কারকভেদে শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার। যেমন : প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

বাংলায় অনেক ক্ষেত্রেই বিভক্তিহীন পদ পাওয়া যায়। এই অনুপস্থিত বিভক্তিকে বলা হয় শূন্য (o) বিভক্তি।

একবচন ও বহুবচনে কারক বিভক্তির রূপ :

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	শূন্য (o), অ, এ, (য়), তে	রা, এরা, গুলি (গুলো), গণ
দ্বিতীয়া	কে, রে, এরে	দিগকে, দিগেরে, দেরে
তৃতীয়া	ঘারা, দিয়া, কর্তৃক	দিগের ঘারা, দের ঘারা, দিগ কর্তৃক
চতুর্থী	কে, রে, এরে	দিগকে, দিগেরে, দেরে
পঞ্চমী	হতে, থেকে, চেয়ে	দিগের হতে, দের হতে, দিগের চেয়ে
ষষ্ঠী	ৱ, এৱ	দিগের, দের, গুলির, গণের
সপ্তমী	এ, য়, তে, এতে	দিগে, দিগেতে, গুলিতে

## ১. কর্তৃকারক

পার্থি ডাকে।

সে ঘায়।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।

উল্লিখিত বাক্য তিনটিতে ডাকে, ঘায় এবং খেয়েছে ক্রিয়াপদ। এই ক্রিয়াগুলো সম্পাদন করছে যথাক্রমে পার্থি, সে এবং বুলবুলি। সুতরাং পার্থি, সে এবং বুলবুলি কর্তৃকারক।

যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্তা বলে এবং ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তৃস্বীকৃত পদই কর্তৃকারক।

## সংজ্ঞার্থ

বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্তৃকারক বলে।

### কর্তৃকারকের প্রকারভেদ

ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্তৃকারক চার প্রকার। যেমন :

**ক. মুখ্যকর্তা** : যে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে, সে-ই মুখ্যকর্তা। যেমন :

ঘোড়া গাড়ি টানে।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।

**খ. প্রযোজক কর্তা** : মূল কর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে ক্রিয়া সম্পন্ন করায়, তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন : মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

এখানে ‘মা’ প্রযোজক কর্তা।

**গ. প্রযোজ্য কর্তা** : মূল কর্তার করণীয় কাজ ঘার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন :

মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

শিক্ষক ছাত্রগণকে পড়াচ্ছেন।

এখানে ‘শিশু’ এবং ‘ছাত্রগণ’ প্রযোজ্য কর্তা।

**ঘ. ব্যতিহার কর্তা** : বাক্যের মধ্যে দুটি কর্তা যখন একত্রে একজাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তখন তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন :

সেয়ানে সেয়ানে লড়াই।

বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়।

### কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভিন্নের প্রয়োগ

- প্রথমা বিভক্তি : শিহাব বই পড়ে।  
 দ্বিতীয়া বিভক্তি : শিল্পকে যেতে হবে।  
 তৃতীয়া বিভক্তি : নজরগুল কর্তৃক অগ্নিবীণা রচিত হয়েছে।  
 ষষ্ঠী বিভক্তি : আমার খাওয়া হয় নি।  
 সপ্তমী বিভক্তি : ছাগলে কী না খায়।

### ২. কর্মকারক

ঘোড়া গাড়ি টানে। শাহেদ বই পড়ে।

সংজ্ঞা : যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্মকারক বলে।

উল্লিখিত বাক্য দুটিতে ‘ঘোড়া’ এবং ‘শাহেদ’ যথাক্রমে ‘গাড়ি’ এবং ‘বই’-কে আশ্রয় করে ‘টানা’ এবং ‘পড়া’ ক্রিয়া সম্পন্ন করে। সুতরাং ‘গাড়ি’ এবং ‘বই’ কর্মকারক।

### কর্মকারকে বিভিন্ন বিভিন্নের প্রয়োগ

- প্রথমা বিভক্তি : পুলিশ ডাক।  
 দ্বিতীয়া বিভক্তি : আমি তাকে চিনি।  
 ষষ্ঠী বিভক্তি : ছেলেটি বলের সঙ্গে যুদ্ধ করে।  
 সপ্তমী বিভক্তি : জিজাসিব জনে জনে।

### ৩. করণ কারক

‘করণ’ শব্দটির অর্থ যন্ত্র, সহায় বা উপায়। অর্থাৎ ক্রিয়া নিষ্পত্তির ব্যাপারে যা প্রধান সহায়, তা-ই করণ।

সংজ্ঞা : কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে করণ কারক বলে। যেমন :

ছেলেরা বল খেলে। বন্যায় দেশ প্রাবিত হলো। কলমটি সোনায় মোড়া।

করণ কারকে সাধারণত তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

### করণ কারকে বিভিন্ন বিভিন্নের প্রয়োগ

- প্রথমা বিভক্তি : ছেলেরা বল খেলে।  
 তৃতীয়া বিভক্তি : আমরা কান ঢারা শুনি।  
 পঞ্চমী বিভক্তি : এ সম্ভান হতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে।  
 ষষ্ঠী বিভক্তি : তার মাথায় লাঠির আঘাত কোরো না।  
 সপ্তমী বিভক্তি : আকাশ মেঝে ঢাকা।

## ৪. সম্প্রদান কারক

‘সম্প্রদান’ অর্থ স্বেচ্ছায় দান।

**সংজ্ঞা :** যাকে স্বত্ত্ব ত্যাগ করে কোনো কিছু দান করা হয়, সেই দান এইভাবে সম্প্রদান কারক বলে।

যেমন :

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। অঙ্গজনে দেহ আলো। বন্ধুহীনে বন্ধ দাও।

কিন্তু ‘স্বত্ত্ব ত্যাগ’ না বোঝালে সম্প্রদান কারক হবে না। যেমন : ধোপাকে কাপড় দাও।

এ ক্ষেত্রে ‘ধোপা’ সম্প্রদান কারক নয় কারণ ‘ধোপাকে’ কাপড় কখনোই স্বত্ত্ব ত্যাগ করে দেওয়া হয় না।

**জ্ঞাতব্য :** সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে বাংলা ভাষায় সম্প্রদান কারকের ব্যবহার চলে আসছে। কিন্তু সম্প্রদান কারক এবং কর্মকারকের বিভিন্ন চিহ্ন এক। কেবল দানের প্রসঙ্গে অনেক ব্যাকরণ-বিশেষজ্ঞ সম্প্রদান কারকের পৃথক অন্তিম স্থীকারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন।

সম্প্রদান কারকে সাধারণত চতুর্থী বিভিন্ন হয়।

### সম্প্রদান কারকে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রয়োগ

প্রথমা বিভিন্ন : শুরু দক্ষিণা দাও।

চতুর্থী বিভিন্ন : দরিদ্রকে দান কর।

ষষ্ঠী বিভিন্ন : ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দাও।

সপ্তমী বিভিন্ন : দীনে দয়া কর।

## ৫. অপাদান কারক

**সংজ্ঞা :** যা থেকে কোনো কিছু বিচ্যুত, পতিত, গৃহীত, জাত, রক্ষিত, বিরত, দূরীভূত ও উৎপন্ন এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন :

বিচ্যুত : বৃক্ষ থেকে পাতা ঝরে।

পতিত : ঘেঁষে বৃষ্টি হয়।

গৃহীত : খিলুক থেকে মুক্তা মেলে।

জাত : জমি থেকে ফসল পাই।

রক্ষিত : বিপদে মোরে রক্ষা কর।

বিরত : পাপে বিরত হও।

দূরীভূত : দেশ থেকে বিপদ চলে গেছে।

উৎপন্ন : তিলে তৈল হয়।

ভীত : সুন্দরবনে বাধের ভয় আছে।

অপাদান কারকে সাধারণত পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

### অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

- |                   |   |                           |
|-------------------|---|---------------------------|
| প্রথমা বিভক্তি    | : | ট্রেনটি ঢাকা ছাড়ল।       |
| দ্বিতীয়া বিভক্তি | : | বাবাকে বড় ভয় পাই।       |
| তৃতীয়া বিভক্তি   | : | তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। |
| পঞ্চমী বিভক্তি    | : | জেলেরা নদী থেকে মাছ ধরছে। |
| ষষ্ঠী বিভক্তি     | : | বাষ্পের ভয়ে সকলে ভীত।    |
| সপ্তমী বিভক্তি    | : | দুধে দই হয়।              |

### ৬. অধিকরণ কারক

সংজ্ঞা : যে স্থানে, যে কালে বা যে বিষয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে ক্রিয়ার আধার বলে। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন :

বনে বাঘ থাকে। বসন্তে কোকিল ডাকে। তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত।

#### প্রকারভেদ

অর্থভেদে অধিকরণ কারক চার প্রকার। যেমন :

- ক. স্থানাধিকরণ; খ. কালাধিকরণ; গ. বিষয়াধিকরণ ও ঘ. ভাবাধিকরণ।
- ক. স্থানাধিকরণ : যে স্থানে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে স্থানাধিকরণ কারক বলে। যেমন : জলে কুমির থাকে।
- খ. কালাধিকরণ : যে কালে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে কালাধিকরণ কারক বলে। যেমন : শরতে শাপলা ফোটে।
- গ. বিষয়াধিকরণ : কোনো বিষয়ে দক্ষতা বা অক্ষমতা প্রকাশে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হলে, তাকে বিষয়াধিকরণ কারক বলে। যেমন : তিনি ইংরেজিতে ভালো। শফিক গণিতে কাঁচা।
- ঘ. ভাবাধিকরণ : একটি ক্রিয়া অন্য ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করলে নির্ভরশীল ক্রিয়াপদটি ভাববাচকে পরিণত হয়ে অধিকরণ হলে, তাকে ভাবাধিকরণ কারক বলে। যেমন : সুর্যোদয়ে অঙ্ককার দূরীভূত হয়। এ ক্ষেত্রে ‘অঙ্ককার দূরীভূত হওয়া’ ‘সুর্যোদয়ের’ ওপর নির্ভরশীল। অতএব ‘সুর্যোদয়ে’ ভাবাধিকরণ কারক।
- অনুবৃত্তি : হাসিতে মুক্তা ঝারে।
- অধিকরণ কারকে সাধারণত সপ্তমী বিভক্তি হয়।

### অধিকরণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

- প্রথমা বিভক্তি : আমি আগামী কাল বাড়ি যাব।  
 দ্বিতীয়া বিভক্তি : মন আমার নচেরে আজিকে।  
 তৃতীয়া বিভক্তি : খিলিপান দিয়ে ঔষধটা খেয়ে নিও।  
 পঞ্চমী বিভক্তি : ছাদ থেকে নদী দেখা যায়।  
 সপ্তমী বিভক্তি : বলে বাঘ থাকে।

### সমন্বয় ও সম্বোধন পদ

বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্য পদের যে সমন্বয়, তাকে কারক বলে। কিন্তু ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যস্থিত অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সমন্বয় পদ বলে। যেমন : রামের ভাই ঢাকা যাবে।

এখানে 'রামের' সঙ্গে 'ভাইয়ের' সম্পর্ক আছে কিন্তু 'যাবে' ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সমন্বয় নেই।

সুতরাং ক্রিয়ার সঙ্গে সমন্বয় পদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে সমন্বয় পদ কারক নয়।

### সমন্বয় পদের বিভক্তি

- ক. সমন্বয় পদে ষষ্ঠী ('র' বা 'এর') বিভক্তি হয়। যেমন : সোনা + র = সোনার (থালা)। তারেক + এর = তারেকের (ভাই)।

- খ. সময়বাচক অর্থে সমন্বয় পদে কার > কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : আজি + কার = আজিকার > আজকের (খবর)। পূর্বে + কার = পূর্বেকার (ঘটনা)।

### সম্বোধন পদ

সম্বোধন অর্থ 'আহ্বান'। যাকে সম্বোধন বা আহ্বান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন :

ওহে ইকবাল, এদিকে এসো।

মাধবী, এখানে এসো।

এখানে 'ইকবাল' ও 'মাধবী' সম্বোধন পদ। কারণ তাদেরকে আহ্বান বা সম্বোধন করে কিছু বলা হয়েছে। সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ কিন্তু এই সম্বোধন পদের সঙ্গে বাক্যের ক্রিয়াপদের কোনো সম্পর্ক নেই। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সমন্বয় থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।

### বিভিন্ন কারকে একই বিভক্তির প্রয়োগ

#### সকল কারকে 'শূন্য' বিভক্তির প্রয়োগ

- কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি : সুজন স্কুলে যায়।

কর্মকারকে ‘শূন্য’ বিভক্তি : ঘোড়া গাড়ি টানে।

করণ কারকে ‘শূন্য’ বিভক্তি : ছেলেরা বল খেলে।

সম্প্রদান কারকে ‘শূন্য’ বিভক্তি : ভিক্ষা দাও দেখিলে ভিস্কুক।

অপাদান কারকে ‘শূন্য’ বিভক্তি : ট্রেনটি ঢাকা ছাড়ল।

অধিকরণ কারকে ‘শূন্য’ বিভক্তি : আমরা ঝুলনা যাব।

### সকল কারকে ‘এ’ বা ‘সঙ্গমী’ বিভক্তির প্রয়োগ

কর্তৃকারকে ‘এ’ বিভক্তি : পাগলে কী না বলে।

কর্মকারকে ‘এ’ বিভক্তি : জিঙ্গাসিব জনে জনে।

করণ কারকে ‘এ’ বিভক্তি : জ্ঞানে বিমল আনন্দ লাভ হয়।

সম্প্রদান কারকে ‘এ’ বিভক্তি : দীনে দয়া কর।

অপাদান কারকে ‘এ’ বিভক্তি : তিলে তৈল হয়।

অধিকরণ কারকে ‘এ’ বিভক্তি : বনে বাঘ থাকে।

### মোটা অক্ষরের পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয়

অর্থ অনর্থ ঘটায়।

কর্মে শূন্য।

অক্ষজনে দেহ আলো।

সম্প্রদানে সঙ্গমী

অন্নহীনে অন্ন দাও।

সম্প্রদানে সঙ্গমী

আকাশ মেঘে ঢাকা।

অধিকরণে শূন্য

আমার ভাত খাওয়া হলো না।

কর্মে শূন্য

আমার খাওয়া হলো না।

কর্তৃকারকে ষষ্ঠী

আকাশে চাঁদ উঠেছে।

অধিকরণে সঙ্গমী

ইট-পাথরের বাড়ি বেশ শক্ত।

করণে ষষ্ঠী

ইটের বাড়ি সহজে ভাঙে না।

করণে ষষ্ঠী

এ কলমে ভালো লেখা হয়।

করণে সঙ্গমী

এ জমিতে সোনা ফলে।

অধিকরণে সঙ্গমী

এ কলমে বেশ লেখা যায়।

করণে সঙ্গমী

কানায় শোক মন্দীভূত হয় ।	অধিকরণে সঙ্গমী
কাচের জিনিস সহজে ভাঙে ।	করণে ষষ্ঠী
কানে কুসুম কলি সকলি ফুটিল ।	অধিকরণে সঙ্গমী
কৃষক লাজল চষছে ।	করণে শূন্য
কালির দাগ সহজে ওঠে না ।	সমন্বে ষষ্ঠী
কাজে মন দাও ।	কর্মে সঙ্গমী
গাড়ি স্টেশন ছাড়ল ।	অপাদানে শূন্য
গগনে গরজে মেঘ ঘন বরবা ।	অধিকরণে সঙ্গমী
গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল ।	কর্তৃকারকে সঙ্গমী
গবুতে গাড়ি টানে ।	কর্তৃকারকে সঙ্গমী
গুরুজনে কর ভক্তি/নতি ।	কর্মে সঙ্গমী
গৃহহীনে গৃহ দাও ।	সম্প্রদানে সঙ্গমী
গগনে গরজে মেঘ ।	কর্তৃকারকে শূন্য
ঝোড়ায় গাড়ি টানে ।	কর্তৃকারকে সঙ্গমী
ঘরেতে ভূম এলো গুনগুনিয়ে ।	অধিকরণে সঙ্গমী
চোরের ভয়ে ঘুম আসে না ।	অপাদানে ষষ্ঠী
ছাদ থেকে নদী দেখা যায় ।	অধিকরণে পঞ্চমী
ছাদে বৃষ্টি পড়ে ।	অধিকরণে সঙ্গমী
ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা ।	অধিকরণে সঙ্গমী
ছাগলে কী না খায় ।	কর্তৃকারকে সঙ্গমী
জলকে চল ।	নিমিত্তার্থে চতুর্থী
জল পড়ে পাতা নড়ে ।	কর্তৃকারকে শূন্য
জমিতে সোনা ফলে ।	অধিকরণে সঙ্গমী
জলের লিখন থাকে না ।	করণে ষষ্ঠী
জিজ্ঞাসিব জনে জনে ।	কর্মে সঙ্গমী

জীবে দয়া করে সাধুজন।	সম্প্রদানে সঙ্গমী
জানে বিমল আনন্দ হয়।	করণে সঙ্গমী
জেলে মাছ ধরে।	কর্তৃকারকে শূন্য
জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।	অধিকরণে সঙ্গমী
ঝিলুকে মুক্তা আছে।	অধিকরণে সঙ্গমী
টাকায় কী না হয়।	করণে সঙ্গমী
ট্রেনটি ঢাকা	অপাদানে
ছেড়েছে।	সমষ্টে ষষ্ঠী
টাকার লোভ ভালো নয়।	কর্মে শূন্য
ডাঙার ডাক।	অধিকরণে সঙ্গমী
তিনি ব্যাকরণে পশ্চিত।	অপাদানে সঙ্গমী
তিলে তৈল হয়।	নিমিত্তার্থে সঙ্গমী
তিনি হজে গেছেন।	অধিকরণে শূন্য
তিনি বাঢ়ি নেই।	করণে শূন্য
তারা ফুটবল খেলে।	অধিকরণে সঙ্গমী
তার ধর্মে মতি আছে।	কর্তৃকারকে সঙ্গমী
দশে মিলে করি কাজ।	অপাদানে সঙ্গমী
দুধে ছানা হয়।	সম্প্রদানে চতুর্থী
দরিদ্রকে ধন দাও।	কর্মে দ্বিতীয়া
ধোপাকে কাপড় দাও।	অপাদানে পঞ্চমী
ধান থেকে চাউল হয়।	কর্মে দ্বিতীয়া
ধনী দরিদ্রকে ঘৃণা করে।	সম্প্রদানে ষষ্ঠী
দেশের জন্য প্রাণ দাও।	সম্প্রদানে শূন্য
দিব তোমা শ্রদ্ধা ভক্তি।	সম্প্রদানে শূন্য
নতুন ধান্যে হবে নবান্ন।	করণে সঙ্গমী
নিজের চেষ্টায় বড় হও।	করণে সঙ্গমী

নজরুল কর্তৃক অগ্নিবীণা রচিত হয়।	কর্তৃকারকে তৃতীয়া
নদীতে মাছ আছে।	অধিকরণে সপ্তমী
শিক্ষককে শ্রদ্ধা করিও।	সম্প্রদানে চতুর্থী
শিকারি বিড়াল গৌকে চেনা যায়।	করণে সপ্তমী
শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান অন্যে কভু নয়।	কর্তৃকারকে শূন্য
সর্বশিষ্যে জ্ঞান দেন গুরু মহাশয়।	কর্মে সপ্তমী
সরোবরে পদ্ম জন্মে।	অধিকরণে সপ্তমী
সব খিলুকে মুক্তা মিলে না।	অধিকরণে সপ্তমী
সূর্য উঠলে অঙ্গকার দূর হয়।	কর্মে শূন্য
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দেব কোথা।	অধিকরণে সপ্তমী
সাপুড়ে সাপ খেলায়।	কর্তৃকারকে শূন্য
সমুদ্রজলে লবণ আছে।	অধিকরণে সপ্তমী
সর্বভূতে দান কর।	সম্প্রদানে সপ্তমী
সে বাঢ়ি নেই।	অধিকরণে শূন্য
হাতে কাজ কর।	করণে সপ্তমী
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে।	অধিকরণে দ্বিতীয়া

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

১। নিচের কোন বাক্যে দ্বিতীয়া বিভক্তির ব্যবহার হয়েছে ?

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| ক. শিমুকে যেতে হবে | খ. সজল গান গায়        |
| গ. দেশের সেবা কর   | ঘ. রাজায় রাজায় যুদ্ধ |

২। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। কোন কারকের উদাহরণ ?

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| ক. কর্তৃ কারক | খ. কর্ম কারক      |
| গ. করণ কারক   | ঘ. সম্প্রদান কারক |

৩। বনে বাঘ থাকে। বাক্যটিতে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকের ৭মী বিভক্তির উদাহরণ ?

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ক. কর্তৃ  | খ. অধিকরণ |
| গ. অপাদান | ঘ. কর্ম   |

### শব্দরূপ

একটি শব্দকে বিভিন্ন কারকে সম্বন্ধ পদ হিসেবে এবং সম্বোধনে ব্যবহার করতে হলে বিভক্তি ও অনুসর্গ যোগ করে সংশ্লিষ্ট শব্দের যে রূপ হয়, তাকে বলা হয় শব্দরূপ। যেমন :

বালক + কে = বালককে, বালক + এর = বালকের।

নিচে বিশেষ শব্দ ‘মানুষ’ এবং সর্বনাম শব্দ ‘আমি’, ‘তুমি’ ও ‘সে’- এর একবচনের ও বহুবচনের শব্দরূপ দেখানো হলো :

#### (ক) বিশেষ শব্দের রূপ : মানুষ

##### মানুষ

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	মানুষ, মানুষে (মানুষ+এ)	মানুষেরা (মানুষ + এরা) মানুষগুলি-গুলো, মানুষগণ, মানুষসকল মানুষদের।
কর্ম	মানুষকে (মানুষ+কে)	মানুষদিগকে, মানুষদেরকে (দিগ+কে) (দের+কে)
করণ	মানুষ দ্বারা, মানুষ দিয়া > দিয়ে মানুষকে দিয়ে	মানুষগুলো দ্বারা, মানুষগুলোকে দিয়ে
সম্প্রদান	মানুষকে (মানুষ + কে)	
অপাদান	মানুষ হইতে, মানুষ হতে, মানুষ থেকে, মানুষের কাছ থেকে	মানুষদিগ হইতে, মানুষদের কাছ থেকে; মানুষগুলোর কাছ থেকে
সম্বন্ধ পদ	মানুষের	মানুষদিগের, মানুষদের, মানুষগুলোর
অধিকরণ	মানুষের	মানুষদিগের, মানুষগণের মানুষগুলোর, মানুষদের
সম্বোধন	হে মানুষ!	হে মানুষগণ, মানুষসব

#### (খ) সর্বনাম শব্দের রূপ : আমি, তুমি, সে

##### আমি

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	আমি	আমরা, আমরা-সব, আমরা-সকলে
কর্ম ও সম্প্রদান	আমাকে	আমাদিগকে > আমাদের, আমাদেরকে
করণ	আমা দ্বারা, আমার দ্বারা, আমাকে দিয়া > দিয়ে	আমাদিগের দ্বারা, আমাদের দ্বারা, আমাদেরকে দিয়ে

অপাদান	আমা হইতে > হতে আমার কাছ থেকে	আমাদিগ হইতে, আমাদিগের নিকট হইতে, আমাদের কাছ থেকে
সম্বন্ধ	আমার, মোর (পদ্য)	আমাদিগের > আমাদের, মোদের (পদ্য) আমা সবাকার (পদ্য)
অধিকরণ	আমাতে, আমার মধ্যে	আমাদিগেতে, আমাদিগের মধ্যে > আমাদের মধ্যে

### তুমি

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	তুমি	তোমরা, তোমরা সব
কর্ম ও সম্প্রদান	তোমাকে	তোমাদিগকে, তোমাদেকে, তোমাদেরকে
করণ	তোমার দ্বারা, তোমাকে দিয়া > দিয়ে	তোমাদিগের দ্বারা, তোমাদের দ্বারা, তোমাদিগকে দিয়া, তোমাদের দিয়ে
অপাদান	তোমা হইতে > হতে, তোমার নিকট হইতে, তোমার কাছ থেকে	তোমাদিগ হইতে, তোমাদিগের নিকট হইতে, তোমাদের কাছ থেকে, তোমাদিগের > তোমাদের তোমা সবাকার
সম্বন্ধ	তোমার তব (পদ্য)	তোমাদিগের > তোমাদের, তোমা সবাকার (পদ্য)
অধিকরণ	তোমাদিগেতে, তোমাদিগের মধ্যে, তোমাদের মধ্যে	তোমাদিগেতে, তোমাদিগের মধ্যে, তোমাদের মধ্যে

### সে

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	সে	তাহারা > তারা, তারা সব
কর্ম ও সম্প্রদান	তাহাকে > তাকে	তাহাদিগকে > তাদেকে, তাদেরকে
করণ	তাহা দ্বারা, তাহার দ্বারা, তাহাকে দিয়ে, তাকে দিয়ে	তাহাদিগ দ্বারা, তাহাদের দ্বারা, তাদের দিয়ে
অপাদান	তাহা হইতে, তাহার নিকট হইতে, তার কাছ থেকে	তাহাদিগ হইতে, তাহাদিগের নিকট হইতে
সম্বন্ধ	তাহার, তার, তস্য	তাদের কাছ থেকে, তাহাদিগের, তাহাদের > তাদের
অধিকরণ	তাহাতে, তাহার মধ্যে > তাতে, তার মধ্যে	তাহাদিগেতে, তাহাদিগের মধ্যে

### বিশেষণের ‘তর’ ও ‘তম’

‘তর’ আপেক্ষিক উৎকর্ষবাচক বা অপকর্ষবাচক প্রত্যয় এবং ‘তম’ বহু বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে একজনের সর্বাধিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষবোধক প্রত্যয়।

দুটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করতে সংক্ষিতের নিয়মানুসারে বিশেষণের সঙ্গে ‘তর’ প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং দুয়ের বেশি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা বোঝাতে বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয় ‘তম’ প্রত্যয়। মোটকথা, সংক্ষিত নিয়ম অনুযায়ী দুয়ের মধ্যে তুলনা করতে হলে বিশেষণের সঙ্গে ‘তর’ এবং বহুর সঙ্গে তুলনা করতে হলে ‘তম’ যোগ হয়।

‘তর’ এবং ‘তম’ এ দুটি প্রত্যয়কে একত্র করে হয়েছে—‘তরতম’, যার অর্থ ‘কম-বেশি’।

লক্ষণীয় ‘তারতম্য’ শব্দটিও ‘তরতম’ থেকে তৈরি। যেমন : তরতম + য = তারতম্য।

### ‘তর’ এবং ‘তম’ -এর প্রয়োগ

মূল বিশেষণ শব্দ	তর-যোগে	তম-যোগ
বৃহৎ	বৃহত্তর	বৃহত্তম
স্কুদ	স্কুদ্রতর	স্কুদ্রতম
মহৎ	মহত্তর	মহত্তম
কঠিন	কঠিনতর	কঠিনতম
জটিল	জটিলতর	জটিলতম
দীর্ঘ	দীর্ঘতর	দীর্ঘতম
প্রশস্ত	প্রশস্ততর	প্রশস্ততম

### ‘তর’ ‘তম’-এর বাক্যে প্রয়োগ

১. চন্দ্ৰ পৃথিবী অপেক্ষা স্কুদ্রতর।
২. হিমালয় পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত।
৩. সাহারা বিশ্বের দীর্ঘতম মৱুভূমি।
৪. কুকুরাজার বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত।
৫. মালদ্বীপ বাংলাদেশের চেয়ে স্কুদ্রতর।
৬. গীতা মিতা অপেক্ষা অধিকতর মেধাবী।
৭. মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী।

### বিশেষণের তারতম্য

কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে অপর ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষ গুণ, অবস্থা ইত্যাদি তুলনা করা যায়। এভাবে তুলনায় ভালো-মন্দ, কম-বেশি বা উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়ে থাকে। এ ধরনের তুলনা করাকে বিশেষণের তারতম্য বলে। বিশেষণের তারতম্য প্রকাশের জন্য বাংলা ও সংস্কৃত দুটি রীতি আছে।

#### বাংলা রীতি

(ক) দুইয়ের মধ্যে তুলনায়, যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তার পরে ‘অপেক্ষা’, ‘চেয়ে’ প্রতি অনুসর্গ যুক্ত হয়।  
যেমন: চাটগাঁৰ চেয়ে ঢাকা বড় শহর। বুপা অপেক্ষা সোনা দামি ইত্যাদি।

(খ) বহুর মধ্যে তুলনায় একটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ জানতে হলে ‘সর্বাপেক্ষা’, ‘সবচেয়ে’, ‘সকলের চেয়ে’ ইত্যাদি পদ বা বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়। যেমন : এ ছাত্রটি সবচেয়ে ভালো। সে সকলের চেয়ে ভালো লেখে ইত্যাদি।

#### সংস্কৃত রীতি

(ক) দুইয়ের মাঝে তুলনায় বিশেষণ শব্দের শেষে ‘তর’ প্রত্যয় এবং দুইয়ের বেশির মাঝে তুলনায় ‘তম’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : বাঘ অপেক্ষা হাতি বৃহত্তর। গাঁয়ে তিনিই বিজ্ঞতম। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

মূল বিশেষণের শব্দ	তর-যোগে	তম-যোগে
ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্রতর	ক্ষুদ্রতম
দীর্ঘ	দীর্ঘতর	দীর্ঘতম
মহৎ	মহত্তর	মহত্তম
বৃহৎ	বৃহত্তর	বৃহত্তম
প্রশস্ত	প্রশস্ততর	প্রশস্ততম

(খ) ‘তারতম্য’ বোঝাতে সংস্কৃত ঈয়স্ত (দুইয়ের মধ্যে) ও ইষ্ট (বহুর মধ্যে) প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন :

মূল বিশেষণ শব্দ	ঈয়স্ত-যোগে	ইষ্ট-যোগে
গুরু	গুরীয়স্ত > গুরীয়ান	গুরিষ্ট
বৃদ্ধ	বৃদ্ধীয়স্ত > বৃদ্ধীয়ান	বৃদ্ধিষ্ট
বলবৎ	বলীয়স্ত > বলীয়ান	বলিষ্ট

বিশেষণের তারতম্য বোঝানোর জন্য সংস্কৃত রীতি খাঁটি বাংলাতেও প্রচলিত। তবে বাংলা ভাষার কিছু নিজস্ব রীতিও আছে। দুয়ের মধ্যে তুলনায় চেয়ে, চাইতে, অপেক্ষা প্রতি অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যেমন:  
জেম্সের চেয়ে যোসেফ বেশি বলবান। রাম অপেক্ষা শ্যাম বুদ্ধিমান।

বহুর সঙ্গে তুলনায় ‘সর্বাপেক্ষা’, ‘সবচেয়ে’, ‘সবচাইতে’, ‘সকলের মধ্যে’, ‘সবার চাইতে’ প্রতি অনুসর্গের ব্যবহার হয়।  
যেমন : পশুর মধ্যে হস্তী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। গাছের মধ্যে বটগাছ সবচেয়ে বিশাল।  
সবচাইতে ভালো খেজুর রস আর শীতের পিঠা।

## ৬. শব্দ গঠন

### শব্দ

এক বা একাধিক ধ্বনির সমষ্টিয়ে তৈরি অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একককে বলা হয় শব্দ। অর্থাৎ ধ্বনির অর্থপূর্ণ মিলন ঘটলে তাকে শব্দ বলে। যেমন : ক + অ + ল + অ + ম শাঁচটি ধ্বনি। এ ধ্বনি শাঁচটির মিলিত রূপ হলো ‘কলম’। ‘কলম’ এমন একটি বস্তুকে বোঝাচ্ছে, যা দিয়ে লেখা যায়। ‘কলম’- ‘ক’, ‘ল’, ‘ম’ ধ্বনিসমষ্টির মিলিত রূপ, যা অর্থপূর্ণ। সুতরাং ‘কলম’ একটি শব্দ।

### শব্দের গঠন

গঠনগত দিক থেকে শব্দ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত : ক. মৌলিক শব্দ ও খ. সাধিত শব্দ।

**ক. মৌলিক শব্দ :** যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন :

আম, বই, কলম ইত্যাদি।

মৌলিক শব্দ গঠনের প্রথম উপায় বর্ণের সঙ্গে বর্ণ যোগ। যেমন :

আ + ম = আম

ব + ই = বই

ক + ল + ম = কলম ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ‘কার’ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ‘ফলা’ বলা হয়। সরল বর্ণের সঙ্গে ‘কার’ বা ‘ফলা’ যোগ করে শব্দ গঠন করা যায়। নিচে ‘কার’ ও ‘ফলা’ যোগে শব্দ গঠনের উদাহরণ প্রদত্ত হলো :

**‘কার’ যোগ করে**

ক + অ = ক, ল + আ = লা দুটোর মিলনে ক + লা = কলা।

উপর্যুক্ত উদাহরণে ক-এর সঙ্গে ‘অ’ যুক্ত হয়ে প্রথমে ‘ক’ হয়েছে এবং ল-এর সঙ্গে ‘আ’ যুক্ত হয়ে ‘লা’ হয়েছে। ‘ক’ ও ‘লা’ মিলিত হয়ে ‘কলা’ শব্দটি গঠিত হয়েছে।

২০<sup>২</sup> উল্লেখ্য, অ-এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ নেই। অ-ব্যঞ্জনের সঙ্গে অঙ্গলীন হয়ে যায়। যেমন : ক + অ = ক, খ + অ = খ।

‘ফলা’ যোগ করে

য-ফলা (ঝ)	:	ক + য	= ক্য।	উদাহরণ : বাক্য, এক্য, আধিক্য।
র-ফলা (ঠ)	:	ক + র	= ক্র।	উদাহরণ : চক্র, বক্র।
ম-ফলা (ঝ)	:	ত + ম	= ত্ব।	উদাহরণ : আত্ব।
		দ + ম	= দ্ব।	উদাহরণ : পদ্ব।
		হ + ম	= হ্ব।	উদাহরণ : ব্রান্ধণ।
ব-ফলা (ঘ)	:	স + ব	= স্ব।	উদাহরণ : নিঃস্ব।
		শ + ব	= শ্ব।	উদাহরণ : অশ্ব, বিশ্ব।

র-এর আরেকটি সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে রেফ [']। রেফ বর্ণের শীর্ষে যুক্ত হয়। যেমন : ক'। উদাহরণ : অর্ক, তর্ক, সতর্ক।

খ. সাধিত শব্দ : যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে।

সাধারণত কোনো মৌলিক বা ভিত্তি শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাকরণিক উপাদান যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়। শব্দের অর্থ-বৈচিত্র্যের জন্য নানাভাবে শব্দের রূপ-রূপান্তর সাধন করা হয়। বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারোপযোগী করে কোনো শব্দ বা শব্দাংশের সঙ্গে অন্য শব্দ বা শব্দাংশের মিলনে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়ে থাকে।

শব্দগঠন : শব্দগঠন বলতে সাধারণভাবে আমরা শব্দ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বুঝে থাকি। নতুন শব্দ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াকে শব্দগঠন বলে। যে কোনো ভাষার শব্দগঠন প্রক্রিয়া দুইটি।

১। প্রত্যয়ের সাহায্যে শব্দগঠন ও

২। সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন

উপসর্গ শব্দগঠনের প্রক্রিয়া নয়, উপাদান মাত্র। কারণ উপসর্গযুক্ত সকল শব্দই সমাস-সাধিত শব্দ; হয় অব্যয়ীভাব সমাস, না হয় প্রাদি সমাস। কাজেই উপসর্গযোগে শব্দগঠন প্রকারান্তরে শব্দগঠনের প্রক্রিয়া আলোচনা করা অবান্দর।

সম্বিধ শব্দগঠনের প্রক্রিয়া নয়। কেননা সম্বিধবদ্ধ শব্দ মাত্রই হয় প্রত্যয়-সাধিত শব্দ, নয় সমাস-সাধিত শব্দ। প্রত্যয় ও সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠনকালে সম্বিধ হলো পাশাপাশি অবস্থিত ধ্বনি-সংযোগের নিয়ম। এ প্রসঙ্গে প্রত্যয়-সম্বিধের সূত্রাবলি অরণযোগ্য।

পদ পরিবর্তন প্রত্যয়ের সাহায্যেই সম্ভব হয়ে থাকে। তাই পদ পরিবর্তন শব্দগঠনের কোনো প্রক্রিয়া নয়। প্রকৃতি-প্রত্যয়ই শব্দগঠনের প্রক্রিয়া।

বিভক্তির সাহায্যে শব্দগঠিত হয় না। বিভক্তিযোগে শব্দ ও ধাতু পদবাচ্য হয়। তাই বিভক্তিযোগে শব্দগঠন আলোচনা করা নির্যাক।

এখন শব্দগঠন প্রক্রিয়া দুইটি আলোচনা করা হলো :

১. প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন : শব্দ বা ধাতুর পরে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন :

মিঠা + আই	= মিঠাই	কুসুম + ইত	= কুসুমিত
চল + অন্ত	= চলন্ত	ক + তব্য	= কর্তব্য
বিমান + ইক	= বৈমানিক	মনু + অ	= মানব

২. সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠন : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদের একপদে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন :

মাতা ও পিতা	= মাতা-পিতা	সিংহ চিহ্নিত আসন	= সিংহাসন
দিন দিন	= প্রতিদিন	বিষাদ বৃপ্ত সিঙ্গু	= বিষাদসিঙ্গু

বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের নিয়ম জানা থাকলে কোন শব্দ ব্যাকরণগত কোন শ্রেণিতে পড়ে, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় এবং বহুল প্রচলিত শব্দের বদলে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। সর্বোপরি ভাষাকে উদ্ধৃতাবে বলতে, পড়তে, লিখতে এবং ভাষার শব্দভাষারকে সমৃদ্ধ করতে শব্দের গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

### উপসর্গযোগে শব্দ গঠন

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ আছে, যেগুলো কখনোই স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। বস্তুত, যেসব অব্যয়-শব্দ ধাতু বা নাম শব্দের পূর্বে বসে শব্দগুলোর অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ বা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, এ সব অব্যয় শব্দই উপসর্গনামে পরিচিত।

উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় : যেমন ‘ভাত’ একটি শব্দ। এর পূর্বে ‘প্র’ অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় ‘প্রভাত’, যার অর্থ ‘প্রতুষ’ বা ‘প্রাতঃকাল’। ‘নাম’ শব্দের পূর্বে ‘প্র’ যোগ করলে হয় ‘প্রণাম’, যার অর্থ ‘অভিবাদন’ বা ‘নমস্কার’। ‘গতি’ শব্দের পূর্বে ‘প্র’ যোগ করলে হয় ‘প্রগতি’, যার অর্থ ‘সামাজিক অগ্রগতি’ বা ‘সমৃদ্ধি’। এখানে একই উপসর্গ একাধিক অর্থদ্যোতনার সৃষ্টি করেছে। আবার উপসর্গভেদে শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। যেমন : ‘নাম’ শব্দের পূর্বে ‘সু’ উপসর্গ যুক্ত হলে হয় ‘সুনাম’। ‘বদ’ উপসর্গ যুক্ত

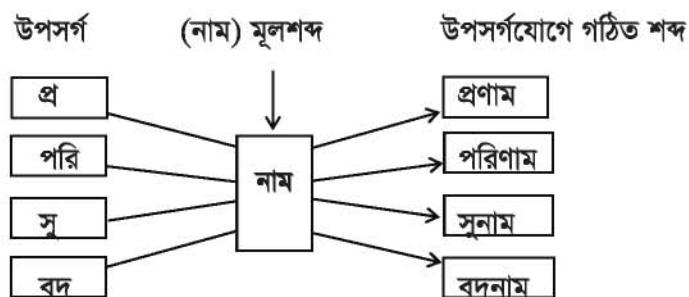
হলে হয় ‘বদনাম’। লক্ষণীয় যে ‘সুনাম’ ও ‘বদনাম’ —এ শব্দ দুটোর অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। এভাবে বিভিন্ন শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বিভিন্ন অব্যয়সূচক শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে।

**সংজ্ঞা :** যেসব অব্যয়সূচক শব্দাংশ ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনপূর্বক অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন বা পরিবর্তন সাধন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে।

### প্রামাণ্য সংজ্ঞা

শব্দ বা ধাতুর আদিতে যা যোগ হয় তাকে বলে উপসর্গ। — ডষ্ট'র রামেশ্বর শ'

নিচে ‘নাম’ মূল শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গযোগে শব্দ গঠনের একটি লেখচিত্র প্রদত্ত হলো :



**উপসর্গের কার্যাবলি :** উপসর্গ একধরনের উপস্থিতি। উপসর্গযোগে শব্দের যে ধরনের পরিবর্তন ঘটে, তা প্রধানত নিম্নরূপ :

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়
২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়
৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে
৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে এবং
৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন সাধিত হয়।

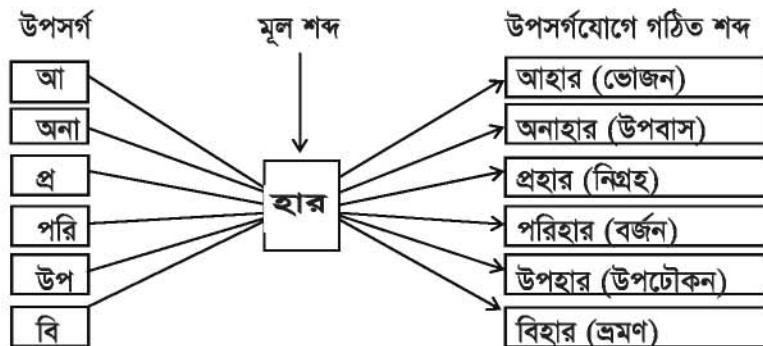
### উপসর্গের অর্থদ্যোতকতা

উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই কিন্তু এরা অর্থের দ্যোতক। উপসর্গ অন্য শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি বা শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন বা পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যেমন :

- হা + ভাত = হাভাত (নতুন শব্দ)
- পরি + পূর্ণ = পরিপূর্ণ (অর্থের সম্প্রসারণ)
- অ + ভাব = অভাব (অর্থের সংকোচন)
- উপ + কথা = উপকথা (অর্থের পরিবর্তন)

কিন্তু ‘হা’, ‘পরি’, ‘অ’, ‘উপ’ -এগুলোর আলাদা কোনো অর্থ নেই। শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত না হলে উপসর্গ ১০

কোনো অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। অর্থাৎ উপসর্গ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করতে অক্ষম। কিন্তু যখনই এরা ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে, তখনই এদের অর্থদ্যোতকতা শক্তি সৃষ্টি হয়। যেমন : ‘হার’ শব্দটির পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গযোগে অনেকগুলো অর্থদ্যোতক শব্দ গঠিত হতে পারে :



উপরের লেখচিত্রে আ, অনা, প্র, পরি, উপ, বি উপসর্গগুলোর স্বাধীন কোনো অর্থ নেই। কিন্তু এ উপসর্গগুলো ‘হার’ শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে অর্থবোধক একাধিক শব্দ তৈরি করেছে। সুতরাং বলা যায় উপসর্গের স্বাধীন কোনো অর্থ নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

### উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ভাষায় উপসর্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উপসর্গ শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে এবং অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন ঘটায়। উপসর্গ নতুন শব্দ সৃষ্টি করে ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। বস্তুত শব্দ গঠন ও অর্থের দিক থেকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাই উপসর্গের কাজ। উপসর্গ অর্থহীন হলেও এদের সার্থক প্রয়োগে ভাষার অভ্যন্তরীণ শক্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়।

### উপসর্গের শ্রেণিবিভাগ

উপসর্গ তিন প্রকার। যেমন :

১. বাংলা উপসর্গ,
২. তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ ও
৩. বিদেশি (বৈতাষিক) উপসর্গ।

### ১. বাংলা উপসর্গ

বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি : অ, অঘা, অঝ, অনা, আ, আড়, আন, আৰ, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভৱ, রাম, স, সা, সু, হা।

### বাংলা উপসর্গযোগে শব্দ গঠন :

উপসর্গ	উদাহরণ
অ	অকাজ, অচিন, অজানা, অখুশি, অচেনা, অমিল, অকাল, অবেলা, অনড়।
অধা	অধাচষ্টী, অধারাম।
অজ	অজপাড়াগাঁ, অজমুর্থ, অজপুকুর।
অনা	অনাৰ্বষ্টি, অনাদর, অনাদায়, অনাসৃষ্টি, অনাচার, অনামুখো, অনাদর, অনাদায়।
আ	আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি, আমাপা, আঘাটা, আকাট, আকাল, আকাঠা।
আড়	আড়চোখে, আড়নয়নে, আড়পাগলা, আড়ক্ষ্যাপ্যা, আড়কোলা, আড়গড়া।
আন	আনকোরা, আনচান, আনমনা।
আব	আবছায়া, আবডাল।
ইতি	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে, ইতিকথা, ইতিহাস।
উন (উনা)	উনপাঁজুরে, উনিশ, উনবর্ষা।
কদ	কদবেল, কদর্য, কদাকার।
কু	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুসঙ্গ, কুনজর, কুকাম, কুযশ।
নি	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিখরচা, নিঙ্গাঁজ, নিরেট, নিলাজ, নিটোল, নিরেট।
পাতি	পাতিকাক, পাতিহাঁস, পাতিলেবু, পাতকুয়া।
বি	বিভুঁই, বিফল, বিপথ, বিদেশ, বিজোড়।
ভর	ভরপুর, ভরপেট, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যা, ভরদিন, ভরসঁাৰ।
রাম	রামছাগল, রামদা।
স	সঠিক, সরব, সলাজ, সটান, সজোৱ, সখেদ, সজ্জান।
সা	সাজোয়ান, সাজিৱা।
সু	সুখবৱ, সুদিন, সুনজৱ, সুনাম, সুড়োল।
হা	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘৱে, হাহতাশ।

### বাক্যে বাংলা উপসর্গযুক্ত শব্দের প্রয়োগ

১. অ : লোকটি আমার অচেনা।
২. অঘা : অঘারাম বলেই সে এমন কাণ্ড করে বসেছে।
৩. অজ : অজপাড়াগাঁয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে।
৪. অনা : অনাৰূপিতে এ বছর ফসলের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে।
৫. আ : আধোয়া প্রেটে খাবার খেতে নেই।
৬. আড় : মিতা রিতার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আছে।
৭. আন : সন্তানের জন্য মায়ের মন সব সময়ই আনচান করে।
৮. আব : আড়ালে আবড়ালে কারো সমালোচনা করতে নেই।
৯. ইতি : ইতিহাস থেকে সকলেরই শিক্ষা নেওয়া উচিত।
১০. উন/উনা : ‘উনাভাতে দুনা বল।’
১১. কদৃ : কদবেলে প্রচুর ভিটামিন আছে।
১২. কু : কুসঙ্গ কুকুল বয়ে আনে।
১৩. নি : মেয়েটির সূচিকর্ম খুবই নির্খুত।
১৪. পাতি : পিলের জলে পাতিহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে।
১৫. বি : সাধনা কখনো বিফলে যায় না।
১৬. ভর : এখন ভরদুপুর, একটু পরে বের হও।
১৭. রাম : রামছাগলের বাচ্চাটা তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে।
১৮. স : সঠিক উন্নরে টিক টিঙ্গ দাও।
১৯. সা : লড়াইয়ে জিততে হলে সাজোয়ান লোকই প্রয়োজন।
২০. সু : সৎকর্ম সুনাম বয়ে আনে।
২১. হা : হাতাতে ছেলেটার জন্য মায়ের কত হাপিত্যেশ।

### ২. তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই সঙ্গে তৎসম উপসর্গও সংস্কৃত শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ তৈরি করে অর্থের সংকোচন বা সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে। উল্লেখ্য, খাঁটি বাংলা উপসর্গ যেমন খাঁটি

বাংলা শব্দের পূর্বে বসে, তেমনি তৎসম উপসর্গও তৎসম (সংকৃত) শব্দের পূর্বে বসে। তৎসম বা সংকৃত উপসর্গের সংখ্যা বিশিষ্টি :

প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দূর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

তৎসম বা সংকৃত উপসর্গযোগে শব্দ গঠন :

### উপসর্গ

### উদাহরণ

প্র : প্রকাশ, প্রভাত, প্রচলন, প্রগতি, প্রহার, প্রতাপ, প্রভাব, প্রচেষ্টা, প্রবেশ, প্রচার, প্রশাখা, প্রদান।

পরা : পরামর্শ, পরাধীন, পরাক্রম, পরাকাষ্ঠা, পরায়ণ, পরাজয়, পরাভূব।

অপ : অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ, অপকর্ম, অপব্যয়, অপযশ, অপব্যাখ্যা, অপসারণ, অপমৃত্য।

সম : সমাদর, সমাগত, সমুখ, সম্পূর্ণ, সংবাদ, সংযম, সম্মান, সমধিক।

নি : নিথর, নিবাস, নিগম, নিচয়, নির্বিত্তি, নিবারণ, নিদাঘ, নিগৃঢ়, নিষ্কলুষ, নিষ্কাম।

অনু : অনুতাপ, অনুগ্রহ, অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুবাদ, অনুবৃপ, অনুকরণ, অনুসরণ, অনুক্ষণ।

অব : অবকাশ, অবসর, অবজ্ঞা, অবমাননা, অবগত, অবগাহন, অবরোধ, অবতরণ, অবরোহণ।

নির্ব : নিরক্ষর, নির্জীব, নিরহংকার, নির্ধারণ, নির্দেশ, নির্ণয়, নির্ভয়, নির্গত, নির্বাসন, নিরীক্ষণ, নিরঙ্কুশ।

দূর : দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম, দুর্লভ, দুর্গম, দুর্জয়, দুর্ঘটনা, দুর্দিন, দুর্নীতি, দুর্বল, দুর্যোগ।

বি : বিজয়, বিপক্ষ, বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ, বিশুষ্ক, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল, বিচরণ, বিক্ষেপ, বিকার, বিপর্যয়।

অধি : অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী, অধিকর্তা, অধিবেশন, অধিবর্ষ, অধিনায়ক, অধিকর্তা, অধিষ্ঠান।

সু : সুকৃষ্টি, সুকৃতি, সুনীল, সুগম, সুলভ, সুকঠিন, সুধীর, সুচতুর, সুরম্য, সুনিপুণ, সুদূর, সুচরিত্র।

উৎ : উৎসব, উৎক্ষিণ্ট, উদ্গ্ৰীব, উত্তোলন, উত্তণ্ড, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপাদন, উচ্চারণ, উদ্দেশ্য।

পরি : পরিপক্ব, পরিপূর্ণ, পরিমাণ, পরিশেষ, পরিসীমা, পরিশ্রম, পরিতাপ, পরিচালক, পরিদর্শন।

প্রতি : প্রতিদান, প্রতিকার, প্রতিক্রিয়া, প্রতিবাদ, প্রতিবেশী, প্রতীক্ষা, প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি, প্রতিদিন।

অভি : অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত, অভিধান, অভিনয়, অভিযান, অভিসার, অভিমুখ, অভিবাদন।

অতি : অতিকায়, অত্যাচার (অতি + আচার), অতিশয়, অতিক্রম, অতিরিক্ত, অত্যন্ত (অতি + অন্ত)।

অপি : অপিনিহিত, অপিনিহিতি, অপিধান।

উপ : উপকার, উপকূল, উপকৃষ্ট, উপদ্বীপ, উপবন, উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা, উপনয়ন (পৈতা)।

আ : আকৃষ্ট, আমরণ, আসমুদ্র, আরক্ষ, আভাস, আদান, আগমন, আগ্রহ, আহার, আরক্ষ।

### বাক্যে তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গযুক্ত শব্দের প্রয়োগ

- প্র : ‘প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ।’
- পরা : ‘পরাজয়ে ডরে না বীর।’
- অপ : অপব্যয় দারিদ্র্য ডেকে আনে।
- সম্ভ : অতিথি সমাদরে কার্পণ্য অনুচিত।
- নি : এখনই বৃষ্টি নামবে, তাকে যেতে নিবারণ কর।
- অব : সমাজের কল্যাণে প্রত্যেকেরই অবদান রাখা উচিত।
- অনু : অনুগ্রহ করে একটু বাইরে আসুন।
- নির : গুরুজনের নির্দেশ অমান্য করো না।
- দুর : দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।
- বি : লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা বিজয় ছিনিয়ে এনেছি।
- সু : সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ।
- উৎ : চাষিদের ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসব।
- অধি : নিজের অধিকার নিজেকেই বুঝে নিতে হবে।
- পরি : হিংসার পরিণাম কখনোই ভালো হয় না।
- প্রতি : অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে।
- উপ : উপকারীর উপকার স্থীকার করা উচিত।
- অভি : ফরহাদ সাহেব একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক।
- অপি : অপিনিহিতি ধ্বনি পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ম।
- অতি : বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হওয়াই স্বাভাবিক।
- আ : আকর্ষ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

১। ‘তর’ ও ‘তম’ প্রত্যয় দুটি যুক্ত হয় কোন রীতিতে ?

ক. বাংলা

খ. সংস্কৃত

গ. দেশী

ঘ. বিদেশী

২। উপসর্গের কাজ-

i. নতুন শব্দ গঠন করা

ii. অর্থের পরিবর্তন করা

iii. অর্থের সম্প্রসারণ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii, ও iii

## কর্ম-অনুশীলন

১। প্র, কার, প্রতি, অব, আ, অভি, অনু, ফি, অ, অনা, বর, রাম, হা, কম— উপসর্গগুলো নিচের ছকে সঠিক শ্রেণিতে বিন্যস্ত কর।

বাংলা উপসর্গ	তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ	বিদেশি উপসর্গ

### প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন

কৃৎ ও তদ্বিত দুই ধরনের প্রত্যয়ই শব্দ গঠনে সহায়ক। ‘যা পরে যুক্ত হয় তা-ই প্রত্যয়।’ সুতরাং যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা প্রাতিপদিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তা-ই প্রত্যয়।

ভাষার সমৃদ্ধি শব্দের ওপর নির্ভরশীল। যে ভাষায় যত বেশি শব্দ আছে, সে ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের একটি অন্যতম রীতি হচ্ছে প্রত্যয়। কিন্তু প্রত্যয়ের নিজের কোনো স্বাধীন অর্থ নেই।

সংজ্ঞা : যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের পরে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে।

উচ্চর মুহূর্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে, ধাতু বা শব্দের উচ্চর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ যুক্ত হইয়া শব্দ প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে প্রত্যয় বলে।

যেমন :

হাত + আ = হাতা; মনু + অ = মানব;  $\sqrt{\text{চল}}$  + অন্ত = চলন্ত;  $\sqrt{\text{ক্}}$  + অক = কারক।

এখানে, ‘আ’, ‘অ’, ‘অন্ত’, এবং ‘অক’—এগুলো প্রত্যয়। ‘হাত’, ‘মনু’ নাম-প্রকৃতি এবং চল’, ‘ক্’ ক্রিয়া-প্রকৃতি।

প্রত্যয়ের শ্রেণিবিভাগ : প্রত্যয় প্রধানত দুই প্রকার। যথা : ১. কৃৎ প্রত্যয় ও ২. তদ্বিত প্রত্যয়।

কৃৎ প্রত্যয় : ধাতুর পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন :

$\sqrt{\text{ধৰ্ম}} + \text{আ} = \text{ধরা}$      $\sqrt{\text{ডুব}} + \text{উরী} = \text{ডুবুরী}$      $\sqrt{\text{দৃশ্য}} + \text{য} = \text{দৃশ্য ইত্যাদি।}$

**তদ্বিতীয় প্রত্যয় :** শব্দের পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে তদ্বিতীয় প্রত্যয় বলে। যেমন :

বাঘ + আ = বাঘা      সোনা + আলি = সোনালি      সঙ্গাহ + ইক = সাঙ্গাহিক ইত্যাদি।

**কৃৎ প্রত্যয় এবং তদ্বিতীয় প্রত্যয়ের মধ্যে আবার ভাগ রয়েছে :**

**কৃৎ প্রত্যয় দুই প্রকার। যথা :**      **ক. সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় ও**

**খ. বাংলা কৃৎ প্রত্যয়।**

**তদ্বিতীয় প্রত্যয় তিনি প্রকার। যথা :**      **ক. সংস্কৃত তদ্বিতীয় প্রত্যয়;**

**খ. বাংলা তদ্বিতীয় প্রত্যয় ও**

**গ. বিদেশি তদ্বিতীয় প্রত্যয়।**

**ক. সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় :** সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী ঐ ভাষার ধাতুর সঙ্গে যেসব সংস্কৃত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাদের সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন :  $\sqrt{k}$  + তব্য = কর্তব্য;  $\sqrt{দৃশ্য}$  + অনট = দর্শন ইত্যাদি।

**খ. বাংলা কৃৎ প্রত্যয় :** সংস্কৃত বা তৎসম ধাতু বিবর্জিত বাংলা ধাতুর সঙ্গে প্রাকৃত ভাষা থেকে আগত যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাদের বাংলা কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন :  $\sqrt{\text{নাচ}}$  + অন = নাচন;  $\sqrt{\text{ডুব্ব}}$  + অন্ত = ডুবন্ত ইত্যাদি।

**ক. সংস্কৃত তদ্বিতীয় প্রত্যয় :** যে তদ্বিতীয় প্রত্যয় সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে সংস্কৃত তদ্বিতীয় প্রত্যয় বলে। যেমন : মনু + ষণ = মানব; লোক + ষণিক = লৌকিক ইত্যাদি।

**খ. বাংলা তদ্বিতীয় প্রত্যয় :** বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ও বিদেশি প্রত্যয় ব্যতীত বাকি প্রত্যয়গুলোকে বাংলা তদ্বিতীয় প্রত্যয় বলে। যেমন : বাঘ + আ = বাঘা; ঘর + আমি = ঘরামি ইত্যাদি।

**গ. বিদেশি তদ্বিতীয় প্রত্যয় :** শব্দের শেষে যেসব বিদেশি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাদের বিদেশি তদ্বিতীয় প্রত্যয় বলে। যেমন : ডাঙ্গার + খানা = ডাঙ্গারখানা, ধড়ি + বাজ = ধড়িবাজ ইত্যাদি।

প্রত্যয়ের মাধ্যমে শব্দগঠনের ক্ষেত্রে ‘প্রকৃতি’ ও ‘প্রাতিপদিক’ এ দুটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

**প্রকৃতি :** শব্দ বা ধাতুর মূলই হচ্ছে প্রকৃতি। অর্থাৎ ‘মৌলিক শব্দের যে অংশকে আর কোনোভাবেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, তাকে বলা হয় প্রকৃতি।’ অথবা, ভাষায় যার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, এমন মৌলিক শব্দকে প্রকৃতি বলে। শব্দ কিংবা পদ থেকে প্রত্যয় ও বিভক্তি অপসারণ করলে প্রকৃতি অংশ পাওয়া যায়।

**প্রকৃতি দুই প্রকার। যথা:** (ক) ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতু,

(খ) নাম-প্রকৃতি বা সংজ্ঞা-প্রকৃতি।

(ক) ক্রিয়া-প্রকৃতি : প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের বিশ্লেষণে মৌলিক ভাব-দ্যোতক যে অংশ পাওয়া যায়, তা যদি অবস্থান, গতি বা অন্য কোনো প্রকারের ক্রিয়া বোঝায়, তাকে ক্রিয়া-প্রকৃতি বলে। যেমন :  $\sqrt{\text{চল}}$ ,  $\sqrt{\text{পড়}}$ ,  $\sqrt{\text{রাখ}}$ ,  $\sqrt{\text{দৃশ্য}}$ ,  $\sqrt{\text{কৃ}}$  প্রভৃতি ক্রিয়া-প্রকৃতি। [চলন্ত = চল (ক্রিয়া-প্রকৃতি) + অন্ত (প্রত্যয়)]

(খ) নাম-প্রকৃতি : প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের বিশ্লেষণে মৌলিক ভাব-দ্যোতক যে অংশ পাওয়া যায়, তা যদি কোনো দ্রব্য, জাতি, গুণ বা কোনো পদার্থকে বোঝায়, তাকে নাম-প্রকৃতি বলে। যেমন : মা, চাঁদ, গাছ, প্রভৃতি নাম-প্রকৃতি।

হাতল = হাত (নাম-প্রকৃতি) + অল (প্রত্যয়) ]

প্রাতিপদিক : বিভিন্নিলাম নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন : হাত, বই, কলম, মাছ ইত্যাদি।

### প্রত্যয় সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

১. ক্রিয়াবাচক শব্দমূলের ক্ষেত্রে ধাতু চিহ্ন (✓) ব্যবহৃত হয়। যেমন :  $\sqrt{\text{চল}} + \text{অন্ত} = \text{চলন্ত}$ ;  $\sqrt{\text{পঠ}} + \text{অক} = \text{পাঠক}$ ।

২. ‘ধাতু’ ও ‘প্রত্যয়’ উভয়কে একসঙ্গে উচ্চারণ করার সময় ধাতুর অন্ত্যধ্বনি এবং প্রত্যয়ের আদিধ্বনি অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রভাবে সমতা প্রাপ্তহয়। যেমন :  $\sqrt{\text{কাঁদ}} + \text{না} = \text{কান্না}$ ;  $\sqrt{\text{রাখ}} + \text{না} = \text{রান্না}$ । উল্লিখিত উদাহরণে ধাতুর অন্ত্যধ্বনি ‘দ’ ও ‘ধ’ প্রত্যয়ের আদিধ্বনি ‘ন’-এর সমতাপ্রাপ্ত হয়েছে।

কৃৎ এবং তদ্বিত প্রত্যয়ের সংখ্যা অনেক। নিচে প্রয়োজনীয় কিছুসংখ্যক প্রত্যয়ের মাধ্যমে শব্দ গঠনের উদাহরণ প্রদত্ত হলো :

### ক. সংকৃত কৃৎ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন

#### ১. অ (অচ)

$\sqrt{\text{পঠ}} + \text{অ} = \text{পাঠ}$ ।  $\sqrt{\text{জি}} + \text{অ} = \text{জয়}$ ।

#### ২. অনীয় (অনীয়রু)

$\sqrt{\text{কৃ}} + \text{অনীয়} = \text{করণীয়}$ ।  $\sqrt{\text{পা}} + \text{অনীয়} = \text{পানীয়}$ ।

$\sqrt{\text{স্মৃ}} + \text{অনীয়} = \text{স্মরণীয়}$ ।  $\sqrt{\text{দৃশ্য}} + \text{অনীয়} = \text{দর্শনীয়}$ ।

#### ৩. তি (তি)

$\sqrt{\text{কৃ}} + \text{তি} = \text{কৃতি}$ ।  $\sqrt{\text{কৃত}} + \text{তি} = \text{কীর্তি}$ ।  $\sqrt{\text{কৃষ্ণ}} + \text{তি} = \text{কৃষ্টি}$ ।  $\sqrt{\text{দৃশ্য}} + \text{তি} = \text{দৃষ্টি}$ ।

### খ. বাংলা কৃৎ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন

১. অ  $\sqrt{\text{কাঁদ}} + \text{অ} = \text{কাঁদ}$ ।  $\sqrt{\text{ধৰ}} + \text{অ} = \text{ধৰ}$ ।  $\sqrt{\text{চল}} + \text{অ} = \text{চল}$ ।  $\sqrt{\text{পড়}} + \text{অ} = \text{পড়}$ ।

২. অন > ওন  $\sqrt{\text{নাচ}} + \text{অন} = \text{নাচন}$ ।  $\sqrt{\text{কাঁদ}} + \text{অন} = \text{কাঁদন}$ ।

৩. আইত  $\sqrt{\text{ডাক}} + \text{আইত} = \text{ডাকাইত} > \text{ডাকাত}$ ।  $\sqrt{\text{সেব}} + \text{আইত} = \text{সেবাইত} > \text{সেবায়েত}$ ।
৪. আনি  $\sqrt{\text{জ্বাল}} + \text{আনি} = \text{জ্বালানি}$ ।  $\sqrt{\text{ঝাঁক}} + \text{আনি} = \text{ঝাঁকানি}$ ।  $\sqrt{\text{নিডু}} + \text{আনি} = \text{নিডানি}$ ।
৫. উক, উকা  $\sqrt{\text{মিশ}} + \text{উক} = \text{মিশুক}$ ।  $\sqrt{\text{খা}} + \text{উকা} = \text{খাউকা} > \text{খেকো}$ ।
৬. তি  $\sqrt{\text{উঠ}} + \text{তি} = \text{উঠতি}$ ।  $\sqrt{\text{ঘাট}} + \text{তি} = \text{ঘাটতি}$ ।  $\sqrt{\text{কাট}} + \text{তি} = \text{কাটতি}$ ।

#### ক. সংস্কৃত তদ্বিত প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন

১. অ (ষ্ট, অণ) মনু + অ = মানব। দনু + অ = দানব। মধু + অ = মাধব।
২. আয়ন (ষ্ণায়ন, ষ্টক) নর + আয়ন = নারায়ণ। দ্বীপ + আয়ন = দ্বৈপায়ন। রাম + আয়ন = রামায়ণ।
৪. ইক (ষ্ণিক, ঠক) অক্ষর + ইক = আক্ষরিক। ইতিহাস + ইক = ঐতিহাসিক। বর্ষ + ইক = বার্ষিক।
৫. ঈ (ইন, ইনী) ধন + ঈ = ধনী। সুখ + ঈ = সুখী। হস্ত + ঈ = হস্তী।
৬. ঈয় (ষ্ণীয়, ছ)

জল + ঈয় = জলীয়। আত্মন + ঈয় = আত্মীয়। মানব + ঈয় = মানবীয়। রাষ্ট্র + ঈয় = রাষ্ট্রীয়।

৭. ত্ব মাত্ত + ত্ব = মাত্তত্ব। মনুষ্য + ত্ব = মনুষ্যত্ব। আত্ম + ত্ব = আত্মত্ব।
৮. বান (বৃত্তপ) ধন + বান = ধনবান। জ্ঞান + বান = জ্ঞানবান। বৃপ + বান = বৃপবান।
৯. মান (মৎ, মতৃপ)

বুদ্ধি + মান = বুদ্ধিমান। ধী + মান = ধীমান। শক্তি + মান = শক্তিমান।

#### খ. বাংলা তদ্বিত প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন

১. অক টোল + অক = টোলক। নোল + অক = নোলক। গোল + অক = গোলক।
২. অল হাত + অল = হাতল। দীঘ + অল = দীঘল। শীত + অল = শীতল।
৩. আ কাঁচ + আ = কাঁচা। চোর + আ = চোরা। গাছ + আ = গাছা।
৪. আই নিম + আই = নিমাই। কান + আই = কানাই। বোন + আই = বোনাই।
৫. আইত > আত্ম সেবা + আইত = সেবাইত। সঙ্গ + আইত = সাঙ্গাইত > সঙ্গাত।
৬. আচি বেঙ্গ + আচি = বেঙাচি। ঘাম + আচি = ঘামাচি। ধুনা + আচি = ধুনাচি।
৭. আন > আনো জুতা + আন = জুতান > জুতানো। বেত + আন = বেতান > বেতানো।
৮. আনি তল + আনি = তলানি। নাক + আনি = নাকানি। চোব + আনি = চোবানি।

৯. আমি      পাকা + আমি = পাকামি।      ছেলে + আমি = ছেলেমি।      ইতর + আমি = ইতরামি।
১০. আর      কাম + আর = কামার।    কুম + আর = কুমার।      চাম + আর = চামার।
১১. আরী ; আরি    কঁসা + আরী = কঁসারী; কঁসারি।      কাঞ + আরী = কাঞ্জারী ; কাঞ্জারি।
১২. উয়া > ও    গাছ + উয়া = গাছুয়া > গেছো।    গাঁ + উয়া = গাঁউয়া > গেঁয়ো।
১৩. ময়      কাদা + ময় = কাদাময়।    ঘর + ময় = ঘরময়।    জল + ময় = জলময়।

#### গ. বিদেশি তদ্বিত প্রত্যয়বোগে শব্দ গঠন

১. আনা, আনি    বাবু + আনা = বাবুয়ানা।    সাহেবি + আনা = সাহেবিয়ানা।    নজর + আনা = নজরানা।
২. খানা    মুদি + খানা = মুদিখানা।    ছাপা + খানা = ছাপাখানা।
৩. খোর    ঘুষ + খোর = ঘুষখোর।    নেশা + খোর = নেশাখোর।    হারাম + খোর = হারামখোর।
৪. গর > কর    কারি + গর = কারিগর, কারিকর।      জাদু + গর = জাদুগর, জাদুকর।
৫. গিরি    বাবু + গিরি = বাবুগিরি।    মুটে + গিরি = মুটেগিরি।    কেরানি + গিরি = কেরানিগিরি।

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

১। প্রতিপদিকের সঠিক উদাহরণ কোনটি ?

- |         |          |
|---------|----------|
| ক. হাতল | খ. হাত   |
| গ. হাতা | ঘ. হাভাত |

২। নিচের কোনটি বিদেশী তদ্বিত প্রত্যয়বোগ গঠিত শব্দ ?

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| ক. বাবু + আনা = বাবুআনা | খ. $\sqrt{\text{পঢ়}} + \text{অ} = \text{পাঠ}$ |
| গ. ধন + ঈ = ধনী         | ঘ. হাত + অল = হাতল                             |

#### কর্ম-অনুশীলন

১. একটি পোস্টার পেপারে নিচের সংজ্ঞাগুলো সাইন পেন দ্বারা লিপিবদ্ধ কর।

প্রত্যয় :

কৃৎ প্রত্যয় :

তদ্বিত প্রত্যয় :

প্রকৃতি :

ক্রিয়া-প্রকৃতি :

নাম-প্রকৃতি :

২. প্রদত্ত শব্দগুলোর প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করে নির্দেশমতো নিচের ছকে সাজাও :

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দশনীয়		
দেশীয়		
গন্তব্য		
উচ্চতর		
নীলিমা		

## ৭. বাক্য

বাক্যের সাধারণ গঠন : উদ্দেশ্য ও বিধেয়

হ্যাপি একটি পুতুল বানাতে চায় ।

কাকিমা বলাইকে খুব ভালোবাসতেন ।

লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড ।

তখন আমার বয়স তেরো বছরের বেশি নয় ।

তুমি কি লিখতে চাও ফুলের মতো কবিতা?

ভাষার মূল উপকরণ বাক্য । উপরের বাক্যগুলোতে পূর্ণাঙ্গ ও অর্থপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে । পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদ একত্রে মিলিত হওয়ার কারণেই বক্তব্য স্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে । উল্লেখ্য, প্রতিটি বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বা অন্বয় যেমন আছে, তেমনি আছে গঠনগত স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং বক্তব্যের অর্থবহুতা । সুতরাং কোনো ভাষায় যে উক্তির সার্থকতা আছে এবং গঠনের দিক থেকে যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সে ধরনের একক উক্তিই ব্যাকরণ শান্তে বাক্য হিসেবে পরিচিত ।

সংজ্ঞা : যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে ।

যদি বলা হয় —

১. ‘মৌলি একটি ... ।’
২. ‘চাও মতো কবিতা ফুলের কি লিখতে তুমি?’
৩. ‘মাছগুলো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে ।’

এগুলো বাক্যের মধ্যে পড়ে না । কারণ ‘মৌলি একটি’ বললে মনের ভাব অসম্পূর্ণ থেকে যায় । ‘চাও মতো কবিতা ফুলের কি লিখতে তুমি?’ এ ক্ষেত্রে অন্বিত পদগুলো খুবই বিযুক্ত । আর ‘মাছগুলো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে’ — বললে অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয় । কারণ, মাছ কখনো আকাশে উড়তে পারে না । উদাহরণগুলো বাক্য হিসেবে সার্থক হবে, যখন বলা হবে —

১. মৌলি একটি পুতুল বানাতে চায় ।
২. তুমি কি ফুলের মতো কবিতা লিখতে চাও?
৩. পাখিগুলো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে ।

বাক্যকে সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন আকাঙ্ক্ষার নিরূপি । আর সুসংহত করার জন্য প্রয়োজন যোগ্যতা ও আসন্তি । সুতরাং একটি সার্থক বাক্যের ভিত্তি আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসন্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত । এই তিনটি

বিষয়ের কোনো একটির অভাব ঘটলে বাক্য নির্থক হয়ে পড়ে। সুতরাং সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যিক। যেমন :

১. আকাঙ্ক্ষা;
২. যোগ্যতা;
৩. আসন্তি।

১. আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পরিকল্পনাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা, তা-ই আকাঙ্ক্ষা। যেমন : ‘আমি গিয়ে দেখলাম’— এতে আকাঙ্ক্ষার নিখৃতি হয় না। যখন বলা হয় — ‘আমি গিয়ে দেখলাম তারা চলে গেছে।’ এখন এটি একটি বাক্য হলো। কেননা, এ কথা বলার পরে আর কিছু জানার আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

২. যোগ্যতা : বাক্যের মধ্যকার পদসমূহের অন্তর্গত ও ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে বন্যা হয়। এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কিন্তু ‘গ্রীষ্মকালে প্রথর রৌদ্রে বন্যা হয়।’ — বললে বাক্যটি অসংলগ্ন মনে হবে এবং ভাব প্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ প্রথর রৌদ্রে কখনো বন্যা হয় না।

৩. আসন্তি : বাক্যের পদগুলোকে সঠিক জায়গায় সন্নিবিষ্ট করার নাম আসন্তি। অথবা, বাক্যের অর্থসংগতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসন্তি।

ছুটিতে ঢাকা তারা পুজোয় যাবেন — এতে একটি সম্পূর্ণ বাক্যের সবগুলো পদই আছে, কিন্তু আসন্তির অভাবে বাক্য হয়নি। পদগুলো অর্থসংগতি রক্ষা করে ঠিকমতো সাজালেই বাক্য হবে। তারা পুজোর ছুটিতে ঢাকা যাবেন।

সাধারণত প্রতিটি বাক্যের দুটি প্রধান অংশ থাকে : ১. উদ্দেশ্য ও ২. বিধেয়

১. উদ্দেশ্য : বাক্যের যে অংশে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে।

২. বিধেয় : বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন : ‘শ্যামা ক্লুলে যায়।’

এখানে ‘শ্যামা’ উদ্দেশ্য এবং ‘ক্লুলে যায়’ বিধেয়। কারণ বাক্যটিতে ‘শ্যামা’ সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাই ‘শ্যামা’ পদটি উদ্দেশ্য। বিধেয় হচ্ছে বাক্যের ‘ক্লুলে যায়’ অংশটি। কারণ ‘ক্লুলে যায়’ কথাটি শ্যামা সম্পর্কে বলা হয়েছে। বিধেয় অংশে অবশ্যই একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে।

ভাষার সৌন্দর্য বর্ধনে কিংবা বক্তব্যের স্পষ্টতার জন্য বাক্য সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়। বাক্যকে সম্প্রসারিত করতে হলে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের পূর্বে এবং পরে সেগুলোর পরিপোষক হিসেবে নানা রকম শব্দ যোগ করতে হয়। তবে উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারণের রয়েছে কতিপয় নিয়ম।

সাধারণত বাক্যের কর্তৃকারকই মূল উদ্দেশ্য হয়। উদ্দেশ্যটি বিশেষ্য পদ হলে বিশেষণ বা অন্য কোনো পদ বা পদসমষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ করা যায়। পক্ষান্তরে, সমাপিকা ক্রিয়াই বিধেয় অংশের মূল।

### উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্প্রসারণ

বাক্যে ‘উদ্দেশ্য’ প্রথমে ও ‘বিধেয়’ পরে বসে। বাক্য দীর্ঘ হলে উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারিত হয়। যেমন:  
উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ

সম্প্রসারণ	উদ্দেশ্য	বিধেয়
রকিবের	ভাই	এসেছে
অত্যাচারী	রাজা	নিহত হয়েছে

### বিধেয়ের সম্প্রসারণ

উদ্দেশ্য	সম্প্রসারণ	বিধেয়
ময়না	ভালো জামগুলো	খেয়ে ফেলেছে
তিনি	যেভাবেই হোক	আজ আসবেন

#### ৭.২ বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ (সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য)

গঠনগত দিক থেকে বাক্য তিনি প্রকার। যথা :

১. সরল বাক্য
২. জটিল বা মিশ্র বাক্য ও
৩. যৌগিক বাক্য।

#### ১. সরল বাক্য

যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন :

ফুল ফুটেছে।

ছেলেরা খেলা করে।

এখানে ‘ফুল’ এবং ‘ছেলেরা’ কর্তা বা উদ্দেশ্য এবং ‘ফুটেছে’, ‘খেলা করে’ সমাপিকা ক্রিয়া বা বিধেয়।

#### ২. জটিল বা মিশ্র বাক্য

যে বাক্যের মধ্যে একটি প্রধান বাক্য থাকে এবং একাধিক বাক্যকে প্রধান বাক্যের ওপর নির্ভরশীল দেখা যায়, তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে।

অথবা, অন্যভাবে বলা যায়, যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড বাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরম্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে।

যেমন : যে পরিশ্রম করে, সে-ই সুখ লাভ করে।

যিনি সৎ পথে চলেন, তিনি সুখী হন।

আশ্রিত বাক্য	প্রধান খণ্ড বাক্য
যে পরিশ্রম করে,	সে-ই সুখ লাভ করে।
যিনি সৎ পথে চলেন,	তিনি সুখী হন।

### ৩. যৌগিক বাক্য

পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য মিলিত হয়ে যখন একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন :

তিনি অর্থশালী কিন্তু শিক্ষিত নন।

হিমেল নিয়মিত পড়াশোনা করে, তাই সে প্রথম হয়।

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো ও, এবং, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি, সুতরাং, অতএব, যেহেতু, যেন প্রভৃতি অব্যয়যোগে সংযুক্ত থাকে।

#### বাক্য গঠনের নিয়ম

বাক্য গঠিত হয় শব্দ দিয়ে এবং বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দকে বলা হয় পদ। বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ বা পদ সাজানোর সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। বাক্যে পদ সংস্থাপনার এ পদ্ধতিকেই বাক্যের পদ সংস্থাপন রীতি বা পদক্রম বলা হয়। ভাষার শুন্দ ও সার্থক প্রয়োগের জন্য পদ সংস্থাপনরীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। বাক্যে পদের এলোমেলো ব্যবহার হলে মনের ভাব সার্থকভাবে প্রকাশিত হয় না। যেমন : ‘ভাই দুই আমরা যাই ঢাকা’ বললে কোনো অর্থ বোঝা যায় না, কিন্তু ঐ শব্দগুলো এভাবে পদক্রম অনুযায়ী সাজালে অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন : ‘আমরা দুই ভাই ঢাকা যাই।’

বাক্যে পদ বসানোর ক্রিয়া প্রচলিত নিয়ম এখানে দেখানো হলো। যেমন :

১. বাক্যে সবচেয়ে প্রচলিত পদবিন্যাস হচ্ছে কর্তা প্রথমে, কর্ম মাঝে এবং ক্রিয়া শেষে। যেমন :

আমি বই পড়ি। সে বাড়ি যায়।

২. ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন :

রানা ডুকরে কাঁদছে। রাহিত দ্রুত হাঁটছে।

৩. বাক্যে কর্ম থাকলে ক্রিয়া বিশেষণ কর্মের আগে বসে। যেমন :

মামুন নীরবে বই পড়ছে। শিক্ষক জোরে চাবুক কষছেন।

৪. সময়বাচক ও স্থানবাচক পদ কর্মের আগে বসে। যেমন :

কাল কলেজ বন্ধ ছিল। আমি বৃহস্পতিবার ঢাকা যাব।

৫. না-বোধক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন :

আমি খাইনি। কে পড়া শেখেনি?

৬. প্রশ্নবোধক সর্বনাম ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন :

আপনি কী চান? আকাশে কী দেখছ?

৭. বিধেয় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে। যেমন :  
ছেলেটা বুদ্ধিমান। লোকটি বোকা।

৮. বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের পরেও বসে। যেমন :  
মুখটি তোমার কিন্তু সুন্দর। প্রাণ তার খুব শক্ত।

তবে মনে রাখতে হবে, এই পদবিন্যাস অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়। বক্তার মনোভাব, বলার বিশেষ ধারা বা স্টাইল ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াদির ওপর নির্ভর করে পদবিন্যাস স্থিতি কেমন হবে।

ଅନୁଶୀଳନୀ

## ବର୍ତ୍ତନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ (ନମୁନା)



କର୍ମ-ଅନୁଶୀଳନ

- ১। একটি সার্থক বাক্যের ‘আকাঙ্ক্ষা’, ‘যোগ্যতা’ ও ‘আসন্তি’ গুণের আলোচনা একটি পোস্টারে পরিসংজ্ঞিত কর।

As a result, the first step in the process of creating a new model is to identify the variables that are likely to influence the outcome. This can be done through a variety of methods, such as reviewing existing literature, consulting with experts in the field, or conducting surveys and interviews with potential users. Once the variables have been identified, they can be used to develop a conceptual model that describes the relationships between them. This model can then be refined through iterative testing and validation, until it accurately represents the real-world system being modeled.

## ৮. বিরামচিহ্ন

### কমা ও উর্ধ্বক্ষমার ব্যবহার

লিখিত বাক্যে ছেদ বা বিরাম বোঝানোর জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাদের সাধারণত ছেদচিহ্ন বা বিরামচিহ্ন বলা হয়। বাক্যের অর্থ ঠিক ঠিক বোঝানোর জন্য বাক্যের মধ্যে এক বা একাধিক জায়গায় অঙ্গ সময় কিংবা বেশি সময় থামার প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া বাক্যের শেষে তো অবশ্যই থামতে হয়। এই থামার সাধারণ নাম বিরাম।

আমরা যখন কথা বলি, তখন একটি বাক্যের সবটুকু অংশ এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারি না। ফুসফুসে বায়ু সঞ্চয়ের বা ফুসফুসকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য খাসযন্ত্র মাঝে মাঝে থামে। তবে এই থামার মধ্যে রয়েছে একটি নিয়মের ধারাবাহিকতা। কেননা, না থেমে একনাগাড়ে বিরামহীনভাবে কথা বলে গেলে অর্থের বিপন্তি ঘটতে পারে। যেমন : ‘তুমি ওখানে যেয়ো না গেলেই গঙ্গোল হবে।’

বাক্যটিতে যে ভাব প্রকাশিত হয়েছে তা মূলত সেখানে গেলেই গঙ্গোল হবে। কিন্তু বাক্যটিতে যদি প্রয়োজনীয় বিরামচিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাহলে অর্থটিই পাল্টে যায় : তুমি ওখানে যেয়ো, না গেলেই গঙ্গোল হবে।

আবার বিরামচিহ্ন অন্যভাবে বিন্যস্ত করলে অর্থের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে : তুমি ওখানে যেয়ো না, গেলেই গঙ্গোল হবে।

যেকোনো ভাষায় লেখ্য-রূপে বিরামচিহ্নের ব্যবহার অপরিহার্য। সুতরাং লেখার ক্ষেত্রে বক্তব্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ এবং তার অর্থকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপনের জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে ছেদ বা বিরামচিহ্ন বলে। বিরামচিহ্ন বক্তব্যকে বা লেখার ভাষাকে বোধগম্য, সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত করে।

### ছেদ বা বিরামচিহ্নের কাজ :

১. বাক্যে ব্যবহৃত পদগুচ্ছকে ভাব অনুসারে অর্থবহ করা।
২. বাক্যাংশ সংগ্রাহিত ও পৃথক করা।
৩. বাক্যের সমাপ্তি নির্দেশ করা।

## বিরামচিহ্নের পরিচয় :

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিরামচিহ্নগুলোর নাম, আকার ও বিরামের সময় উল্লেখ করে নিচে একটি তালিকা দেওয়া হলো :

ক্রমিক	বিরামচিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতিকাল
১	কমা	,	১ (এক) বলতে যে সময় লাগে।
২	সেমিকোলন	;	১ (এক) বলার দ্বিতীয় সময়কাল।
৩	দাঁড়ি বা পূর্ণচেদ	।	১ (এক) সেকেন্ড কাল পরিমাণ।
৪	জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন	?	ঐ
৫	বিস্ময়চিহ্ন	!	ঐ
৬	কোলন	:	ঐ
৭	কোলন ড্যাশ	:-	ঐ
৮	ড্যাশ	—	ঐ
৯	হাইফেন	-	কোনোরূপ বিরতির প্রয়োজন নেই।
১০	ইলেক বা লোপচিহ্ন	,	ঐ
১১	উদ্বৃত্তচিহ্ন	“ ”	১ (এক) বলতে যে সময় লাগে।
১২	অ্যাকেট বা বক্সনীচিহ্ন	( )	কোনো রূপ বিরতির প্রয়োজন নেই।
		{ }	ঐ
		[ ]	ঐ
১৩	ধাতু দ্যোতক চিহ্ন	√	ঐ
১৪	পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন	<	ঐ
১৫	পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন	>	ঐ
১৬	সমান চিহ্ন	=	ঐ
১৭	বর্জনচিহ্ন	...	ঐ
১৮	সংক্ষেপণ চিহ্ন	.	ঐ

বর্তমান অধ্যায়ে কমা (,) ও উর্ধ্বকমা (') সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

**১. কমা (,)** : কমা-কে বাংলায় পাদচ্ছেদ বলা হয়। কমার মূল কাজ পূর্ণ একটি বাক্যকে ভাবানুসারে একাধিক অংশে ভাগ করা। যেকোনো রচনায় দাঁড়ি (।) ছাড়া অন্য সব বিরামচিহ্নের মধ্যে কমার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ‘কমা’ সংশ্লিষ্ট পদের পর নিচের দিকে ব্যবহৃত হয়। রচনার ধরন এবং তাব পরিস্কৃটনে লেখকের আকাঙ্ক্ষার ওপরে কমার ব্যবহার নির্ভরশীল।

কমা (,)-র বিরতিকাল ১ (এক) বলতে যতটুকু সময় প্রয়োজন ততটুকু পরিমাণ।

### কমা (,) ব্যবহারের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১. বাক্যে অর্থ-বিভাগ দেখাবার জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন, সেখানে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন : উন্নতি চাও, উন্নতি পাবে পরিশ্রমে।

২. বাক্যে একই পদবিশিষ্ট একাধিক শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হলে শেষ পদটি ছাড়া বাকিগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক কমা ব্যবহার করে একজাতীয় পদকে পৃথক করা হয়। যেমন : বিশেষ পদের পরে : সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার — মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় আত্মোৎসর্গ করেছেন।

৩. একজাতীয় একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ পাশাপাশি ব্যবহৃত হলে কমা ব্যবহার করে তাদের আলাদা করতে হয়। যেমন : হিমেল ঘরে তুকল, বইপত্র রাখল, জামাকাপড় ছাড়ল, তারপর বিশ্রাম নিল।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তির পূর্বে কমা বসে। যেমন : সুনীল বলল, ‘আমার বাবা বাড়ি নেই।’

৫. সম্মোধন পদের পরে কমা বসে। যেমন : বিশাখা, এদিকে এসো।

৬. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ডবাক্যের পরে ‘কমা’ বসে। যেমন : যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই কেবল এ কথা বিশ্বাস করে।

৭. উপাধিক্রমের মধ্যে ‘কমা’ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কারো নামের শেষে একাধিক ডিপ্রি থাকলে কমা বসে। যেমন : ফয়সাল আহমেদ, এমএ, পিএইচডি।

### কমার উদাহরণ :

বিশেষণ পদের পরে কমার উদাহরণ : সৎ, বিনয়ী, অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী ছাত্রাই জীবনে সাফল্য লাভ করে।  
সর্বনাম পদের পরে কমার উদাহরণ : তুমি, আমি, সে—আমরা তিনজনই ঢাকা যাব।

ক্রিয়াপদের পরে কমার উদাহরণ : এলেন, দেখলেন, চলে গেলেন।

**২. উর্ধ্বকমা (')** : যতগুলো বিরামচিহ্ন আছে, তন্মধ্যে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিরামচিহ্ন। উর্ধ্বকমা পদের মধ্যবর্তী কোনো একটি বর্ণের ওপরে জায়গা দখল করে নেয়। উর্ধ্বকমার কোনো বিরতিকাল নেই। এই চিহ্নকে ‘ইলেক’ বা ‘লোপচিহ্ন’ নামে অভিহিত করা হয়। উর্ধ্বকমার ব্যবহার বর্তমানে খুবই কমে গেছে। তবে পুরনো বাংলা রচনায়, বিশেষত ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত-বূপে ব্যাপক হারে উর্ধ্বকমা ব্যবহৃত হতো। নিচে উর্ধ্বকমা ব্যবহারের কতিপয় ক্ষেত্র উদাহরণসহ দেখানো হলো :

১. উর্ধ্বকমার পুরনো ব্যবহার সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে, বাংলা ভাষার সাধুরাইতির ক্রিয়া, সর্বনাম এবং কিছু সংখ্যাশব্দে চলিতরাইতির সংক্ষিপ্ত-বূপ নির্দেশ করতে উর্ধ্বকমার ব্যবহার হতো। যেমন :

### ক্রিয়ার উদাহরণ :

সাধুরীতি (ক্রিয়ার দীর্ঘরূপ)	চলিতরীতি (ক্রিয়ার সংক্ষিপ্তরূপ)
হইতে	হ'তে
উপরে	'পরে
করিয়াছি	ক'রেছি

### সর্বনামের উদাহরণ :

সাধুরীতি (সর্বনামের দীর্ঘরূপ)	চলিতরীতি (সর্বনামের সংক্ষিপ্তরূপ)
তাহার	তা'র
তাহাদের	তা'দের

### সংখ্যাশদের উদাহরণ :

সাধু সংখ্যাশদের পূর্ণরূপ	চলিত সংখ্যাশদের রূপে উর্ধকমা
দুইটি	দু'টি
একশত	একশ'

২. অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে উর্ধকমা : অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্থবিভাগ্নি ঘটার আশঙ্কা থাকলে সে ক্ষেত্রে উর্ধকমার ব্যবহার হয়। যেমন : 'তুমি কেমন ক'রে গান করো হে গুণী !'

৩. অবসংখ্যা সংক্ষেপণে উর্ধকমা : কিছুসংখ্যক অবসংখ্যা বিভিন্ন কারণে এতটাই তাৎপর্য মণ্ডিত ও সুপরিচিত থাকে যে বাক্যের মধ্যে তা পুরোটা না লিখেও বোঝানো যায়। যেমন :

'৫২-র ভাষা আন্দোলন। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।

### বিরামচিহ্ন প্রয়োগের ক্রিয়ায় নমুনা

১. রে পথিক রে পাষাণ হৃদয় পথিক কী লোভে এত ত্রস্তে দৌড়াইতেছ কী আশায় খণ্ডিত শির বর্ণার অঞ্চলাগে বিন্দু করিয়া লইয়া যাইতেছ এ শিরে হায় এ খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কী

### বিরামচিহ্নের প্রয়োগ :

রে পথিক! রে পাষাণ হৃদয় পথিক! কী লোভে এত ত্রস্তে দৌড়াইতেছ? কী আশায় খণ্ডিত শির বর্ণার অঞ্চলাগে বিন্দু করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে হায়! এ শিরে তোমার প্রয়োজন কী?

২. আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না তাহার সে ঝুলি নাই তাহার সে লসা চুল নাই তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম কহিলাম কি রে রহমত কবে আসিলি?

### বিরামচিহ্নের প্রয়োগ :

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম। কহিলাম, “কি রে রহমত, কবে আসিলি?”

৩. যে শব্দকে ভালোবাসে খুব শব্দকে আদর করে করে যে খুব সুখ পায় সে-ই হতে পারে কবি কবিরা গোলাপের মতো সুন্দর সুন্দর কথা বলেন চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখেন তুমিও গোলাপের মতো সুন্দর কথা বলতে চাও চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখতে চাও তোমার যদি শব্দের জন্যে আদর-ভালোবাসা না থাকে তাহলে পারবে না তুমি গোলাপের মতো লাল গন্ধুরা কথা বলতে চাঁদের মতো জ্যোৎস্নাভরা স্বপ্ন দেখতে।

### বিরামচিহ্নের প্রয়োগ :

যে শব্দকে ভালোবাসে খুব, শব্দকে আদর করে করে যে খুব সুখ পায়, সে-ই হতে পারে কবি। কবিরা গোলাপের মতো সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখেন। তুমিও গোলাপের মতো সুন্দর কথা বলতে চাও, চাঁদের মতো স্বপ্ন দেখতে চাও? তোমার যদি শব্দের জন্যে আদর-ভালোবাসা না থাকে, তাহলে পারবে না তুমি গোলাপের মতো লাল গন্ধুরা কথা বলতে, চাঁদের মতো জ্যোৎস্নাভরা স্বপ্ন দেখতে।

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

- ১। বিরাম চিহ্নের কাজ হলো-
- বাক্যকে ভাব অনুসারে অর্থবহ করা
  - বাক্যাংশ সংগ্রাহিত ও পৃথক করা
  - বাকের সমাপ্তি নির্দেশ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii, ও iii

### কর্ম-অনুশীলন

১। প্রদত্ত বিরামচিহ্নগুলোর ‘আকৃতি’ ও বিরতিকাল নিচের ছকে লিপিবদ্ধ কর :

বিরামচিহ্ন	আকৃতি	বিরতিকাল
কমা		
সেমিকোলন		
দাঁড়ি		
কোলন		
ড্যাশ		
হাইফেন		
প্রশ্নবোধক চিহ্ন		
বিস্ময়চিহ্ন		
ধাতু দ্যোতক চিহ্ন		

## ৯. বানান

### বানানের নিয়ম : ণত্ত ও ষত্ত-বিধান

ভাষা প্রবহমান ও পরিবর্তনশীল। প্রতিটি ভাষার ক্ষেত্রেই সুনিয়াজ্ঞিত ও সুশৃঙ্খল বানান পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনস্থীকার্য। বাগ্ধুবনিকে বর্ণ বা হরফের সাহায্যে লিখিত রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়াই হচ্ছে বানান। বানান মূলত শব্দমধ্যস্থ বর্ণসমূহের বিশ্লেষণ বা ধারাবাহিক বর্ণনা হলেও বানানরীতি ব্যাকরণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো ভাষার মৌলিক শব্দের গাঠনিক রূপ কী ধরনের হবে কিংবা যৌগিক শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে বানানের নিয়মে কোনো পরিবর্তন আসবে কি না, তা জানার একমাত্র উপায় বানানরীতি।

একই শব্দের একাধিক বানান বিভাগের সৃষ্টি করে। বাংলা ভাষা হাজার বছরের পুরনো। বাংলা ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে বানানের কোনো সুনির্ধারিত নিয়ম না থাকায় একই শব্দের একাধিক বানান চলে এসেছে। বাংলা বানানের নিয়ম বেঁধে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত ‘বাংলা বানানের নিয়ম’—এর প্রথম সংক্রণ এবং ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় সংক্রণ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৮ সালে বাংলা বানানের একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমী ‘প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’ প্রণয়ন করে। এ নিয়ম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে। ভাষার সামগ্রিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য বানানের নিয়ম জানা প্রয়োজন।

বাংলা ভাষার শব্দভাগের বহুদিন ধরে নানা উৎসজাত শব্দের সমাবেশে গড়ে উঠেছে। উৎসগত দিক থেকে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তত্ত্ব, দেশি ও বিদেশি—এই প্রধান পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। এই পাঁচ ধরনের শব্দের মধ্যে ‘তৎসম’, ‘অর্ধ-তৎসম’ ও ‘তত্ত্ব’ শব্দ সংকৃত উৎসজাত। দেশি শব্দগুলো প্রাক-আর্য, দ্বাবিড়, অস্ত্রিক প্রভৃতি অনার্য জাতির ভাষা থেকে এসেছে। বিদেশি বা বৈভাষিক শব্দসমূহ আরবি, ফারসি, পতুর্গিজ, তুর্কি, ইংরেজি, ফরাসি, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষা থেকে আগত।

ণত্ত-বিধান ও ষত্ত-বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সংক্ষত থেকে সরাসরি যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে, সেগুলোই তৎসম শব্দ। ‘তৎ’ বলতে বোঝায় ‘সংকৃত’। অর্থাৎ যা সংকৃতের মতো তা-ই তৎসম।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে যেসব শব্দ তৎসম, কেবল সেগুলোর বানানে মূর্ধন্য-ণ এবং মূর্ধন্য-ষ ব্যবহৃত হয়। তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ ও মূর্ধন্য-ষ প্রয়োগের বিশেষ নিয়ম রয়েছে।

লক্ষণীয় যে, দস্ত্য-ন এবং মূর্ধন্য-ণ -এর মধ্যে ধ্বনিগত বা উচ্চারণগত কোনো পার্থক্য নেই। অন্দুপ দস্ত্য-স এবং মূর্ধন্য ষ-এর মধ্যেও ধ্বনিগত বা উচ্চারণগত কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু বানানের ক্ষেত্রে এদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগবিধি বা ব্যবহার রয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে কীভাবে দস্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়ে যায় এবং কীভাবে দস্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়ে যায়, তা জানা প্রয়োজন।

### গত্ত-বিধান

যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানানে দস্ত্য-ন -এর পরিবর্তে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়, তাকে গত্ত-বিধান বলে। অথবা, তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মকে গত্ত-বিধান বলে। যেমন : ঝণ, তৃণ, হরণ, করণ, চরণ, ভাষণ, ভূষণ, শোষণ, লক্ষণ ইত্যাদি।

### গত্ত-বিধানের নিয়মাবলি

১. তৎসম শব্দে ঝ, র, ষ — এই তিনটি বর্ণের পরে এবং ঝ-কার, র-ফলা, রেফ, ষ-এর পরে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়। যেমন :

(ক) ঝ বা ঝ-কার (<)-এর পর মূর্ধন্য-ণ :

ঝণ, ঘৃণা, তৃণ, মসৃণ।

(খ) র -এর পর মূর্ধন্য-ণ :

বরণ, কিরণ, উচ্চারণ, চরণ, বিতরণ, হরণ, জাগরণ, ব্যাকরণ, নিবারণ।

(গ) র-ফলা (ঢ)-এর পর মূর্ধন্য-ণ :

আমত্রণ, মুদ্রণ, মিশ্রণ, চিত্রণ, শ্রেণি।

(ঘ) রেফ (‘)-এর পর মূর্ধন্য - ণ :

অর্ণব, কর্ণ, পূর্ণ, দীর্ঘ, বর্ণ, ঝর্ণা, স্বর্ণ, বর্ণনা, শীর্ণ।

(ঙ) ষ-এর পর মূর্ধন্য-ণ :

অন্নেষণ, দ্রুষণ, বর্ষণ, ভাষণ, প্রেষণ, আকর্ষণ, ঘর্ষণ, বিশ্লেষণ, ভূষণ, শোষণ।

(চ) ষ্ফ (ক + ষ)-এর পর মূর্ধন্য - ণ :

ষ্ফণ, শিষ্ফণ, রক্ষণ, প্রশিষ্ফণ, লক্ষণ।

দ্রষ্টব্য : মূর্ধন্য-ণ মূর্ধন্য-ষ-এর পরে যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠন করলে তা ষ্ফ-এর রূপ নেয়। (ষ্ফ-এর বিশ্লিষ্ট রূপ হচ্ছে ষ + ণ)

উদাহরণ : উষ্ণ, ষ্ফয়িষ্ণু, তৃষ্ণা, কৃষ্ণ, বর্ধিষ্ণু।

২. একই শব্দের মধ্যে ঝ, ঝ-কার (ঢ), র, রেফ (‘), র-ফলা (ঢ) অথবা ষ-এর যেকোনোটির পরে যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), প-বর্গ (প, ফ, ব, ভ, ম) এবং য য হ কিংবা ৎ -এসব বর্ণের এক বা একাধিক বর্ণ থাকে, তবে তার পরবর্তী দস্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :

অর্পণ, কৃপণ, দর্পণ, হরিণ, বৃংহণ, শ্রবণ।

৩. যুক্তব্যঞ্জনে ট-বর্ণের বর্ণগুলোর (ট ঠ ড ঢ) পূর্বে দস্ত্য-ন-এর পরিবর্তে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :

কষ্টক, ঘট্টা, কষ্ট, গুষ্টন, পঞ্চিত।

৪. প্র, পরা, পূর্ব, অপর -এগুলোর পর 'অহ' শব্দ বসলে 'অহ' শব্দের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :

প্রাহু	(প্র + অহ = প্রাহু)।	পরাহু	(পর + অহ = পরাহু)।
পূর্বাহু	(পূর্ব + অহ = পূর্বাহু)।	অপরাহু	(অপর + অহ = অপরাহু)।

৫. কতকগুলো তৎসম শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :

অগু	কোণ	গণ্য	তৃণ	পণ্য	বিপণি	লবণ
আপণ	গণ	গণিত	নগণ্য	পুণ্য	বীণা	লাবণ্য
কঙ্কণ	গণক	গুণ	নিকুণ	ফণী	বেণু	শোণিত

#### ষত্ত-নিমেধ (বানানে দন্ত্য-ন)

১. যুক্ত ব্যঙ্গনে ত-বর্গের (ত থ দ ধ ন) পূর্বে দন্ত্য-ন হয়। যেমন :

অত, দুরত্ত, শাত্ত, গ্রাহ্ণি, পাহু, বন্দুক।

২. ঝ, র, ষ-এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, ঘ, য়, হ কিংবা ৎ ব্যতীত অন্য বর্ণ থাকলে পরবর্তী দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন :

অর্জন, বর্জন, দর্শন, বিসর্জন, গিন্নি, সোনা।

৩. বিদেশি শব্দের বানানে সর্বদা দন্ত্য-ন হয়। যেমন :

আয়রন, ক্লোরিন, ফ্রিন, ড্রেন, ইস্টার্ন, কেরানি, জার্মান, ফার্নিচার, সেকেন্ড।

৫. ক্রিয়াপদের বানানে দন্ত্য-ন হয়। যেমন :

করেন, করানো, ধৰুন, ধরেন, পারেন।

৬. সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদে ঝ র ষ থাকলেও পর পদের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ না হয়ে অপরিবর্তিত থাকে। যেমন :

অঘনায়ক ত্রিনয়ন দুর্নাম মৃগনাভি সর্বনাম হরিনাম।

#### ষত্ত-বিধান

যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানানে দন্ত্য-স -এর পরিবর্তে মূর্ধন্য-ষ ব্যবহৃত হয়, তাকে ষত্ত-বিধান বলে।

অথবা, তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ষ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মকে ষত্ত-বিধান বলে। ঝাষি, ত্বষা, বৰ্ষ, বৃষ্টি, কাষ্ট ইত্যাদি।

## ষত-বিধানের নিয়মাবলি

১. ঝি বা ঝি-কারের পরে দন্ত্য-স-এর পরিবর্তে মূর্ধন্য-ষ ব্যবহৃত হয়। যেমন :

କୃଷକ, କୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀ, କୃଷାଣ, ତୃଷା, କୃଷ୍ଣା ।

**ব্যতিক্রম :** কৃশ ধাতু থেকে জাত কৃশ, কৃশতা, কৃশঙ্গ, কৃশঙ্গী, কৃশানু, কৃশোদর।

২. রেফ (‘)-এর পরে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

আকর্ষণ, চিকীর্ষা, বর্ষণ, বিমর্শ, মুমৰ্শ, ঈর্ষা, পর্ষদ, মহৰ্ষি, শীৰ্ষ।

**ব্যক্তিক্রম :** অর্শ, আদর্শ, দর্শন, পরামর্শ, বর্ণী, স্পর্শ ইত্যাদি।

৩. ট এবং ঠ-এর পূর্বে যুক্ত দণ্ড্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

$$4 + 5 = 9$$

ଅଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ବୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ପୁଷ୍ଟି ମୁଷ୍ଟି ହୃଷ୍ଟ |

$$x + t = t$$

କାଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠ ବଲିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ଜୈଷ୍ଠ ସୁଷ୍ଠ |

৪. ই-কারান্ট এবং উ-কারান্ট উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুর দণ্ড্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

ই-কার্যালয় উপসর্গ

অভিযন্তা অভিযন্তা পরিষদ প্রতিবেদক বিষয়া

অভিষিক্ত নিম্নগু প্রতিষ্ঠান বিষয় বিষম।

উ-কার্বন্ট উপসর্গ

ଅନୁଷତ ଅନୁଷ୍ଟାନ ସୁଷମ ସୁଶୁଷ୍ଟ ସୁଶୁଷ୍ଟି ।

**ব্যক্তিগত :** অভিসার, অভিসন্ধি, অভিসম্পাত ইত্যাদি।

৫. সন্ধিতে বিসর্গযুক্ত ই-কার বা উ-কারের পর ক খ প ফ-এর যেকোনো একটি থাকলে বিসর্গ (ঃ) স্থানে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

**নিষ্প্রত** (নিঃ + প্রত)।                    **নিষ্কর** (নিঃ + কর)।

উঃ + [ক / খ / গ / ফ] = উঃ + [ক / খ / গ / ফ]

ଆୟୁଷକାଳ (ଆୟୁଃ + କାଳ)।

**দুষ্কৃত** (দুঃ + কৃত) |

চতুষ্পদ (চতুঃ + পদ)।

৭. সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর মূর্ধন্য-ষ ব্যবহৃত হয়। যেমন :

কল্যাণীয়েমু	শ্রদ্ধাস্পদেমু	স্নেহাস্পদেমু	বন্ধুবরেমু	সুজনেমু।
--------------	----------------	---------------	------------	----------

৮. কতকগুলো তৎসম শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :

অভিলাষ	দৃষ্টি	ভাষা	ঈষৎ	তুষার
বিষয়	শেষ	পাষাণ	বিষ	মানুষ।

### ষষ্ঠি-নিষেধ (বানানে দন্ত্য-স)

১. তত্ত্ব বা খাঁটি বাংলা শব্দে মূর্ধন্য-ষ হয় না, দন্ত্য-স হয়। যেমন : মিনসে।

২. অ, আ বর্ণে বিসর্গ (ঃ) থাকলে অতঃপর ক, খ, প, ফ থাকলে সঙ্গিতে বিসর্গের স্থানে দন্ত্য-স হয়। যেমন :

নমকার (নমঃ + কার)	তিরক্ষার (তিঃ + কার)	মনক্ষাম (মনঃ + কাম)
-------------------	----------------------	---------------------

৩. বিদেশি শব্দে, বিশেষ করে ইংরেজি শব্দে ৎ : উচ্চারণছলে স্ট হয়। যেমন :

আগস্ট	স্টেশন	ফটোস্ট্যাট	স্টুডিও	মাস্টার
স্টেডিয়াম।				

৪. 'সাঁ' প্রত্যয়ের দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন :

আগ্নিসাঁ	ধূলিসাঁ	ভূমিসাঁ।
----------	---------	----------

৫. সম্ভাষণসূচক স্তীর্বাচক শব্দে আ-কারের পর মূর্ধন্য-ষ না হয়ে দন্ত্য-স হয়। যেমন :

কল্যাণীয়াসু	মাননীয়াসু	সুজনীয়াসু
পূজনীয়াসু	সুচরিতাসু	সুপ্রিয়াসু।

### অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

১. বাংলা বানানের নিয়ম বেঁধে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানটি অঞ্চলী ভূমিকা পালন করে ?

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়   | খ. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড |
| গ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | ঘ. বাংলা একাডেমি।                        |

২. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ ?

- |        |        |
|--------|--------|
| ক. বরণ | খ. চরণ |
| গ. ধরণ | ঘ. হরণ |

### কর্ম-অনুশীলন

১। নিচের উদাহরণগুলো সমজাতীয়তার ভিত্তিতে একই গুচ্ছ সাজাও এবং প্রতিটি গুচ্ছের বিপরীতে গত্ত-বিধানের সংশ্লিষ্ট নিয়মটি লেখ। উদাহরণ : খণ, কটক, দর্পণ, তৃণ, প্রণাম, অপরাহ্ন, চন্দ্রায়ণ, পরিণাম, কর্ত, বাণিজ্য, পূর্বাহ্ন, পরায়ণ, গ্রহণ, বর্ণ, পণ্য, ভাষণ, মাণিক্য, উষ্ণ, হরিণ, বিশ্লেষণ, উত্তরায়ণ, গণ।

প্রদত্ত শব্দ	যে নিয়মে মূর্ধন্য-ণ হয়েছে

২। নিচের উদাহরণগুলো সমজাতীয়তার ভিত্তিতে একই গুচ্ছ সাজাও এবং প্রতিটি গুচ্ছের বিপরীতে ষত্ত-বিধানের সংশ্লিষ্ট নিয়মটি লেখ। উদাহরণ : কষ্ট, অভিযেক, নষ্ট, ভাষা, অনুষ্ঠান, চতুর্ষিংহ, খৰ্ষি, মিষ্টি, আবিক্ষার, তৃষ্ণা, পরিষদ, বৃষ্টি, আষাঢ়, দুষ্প্রাপ্য, জিগীয়া, বহিক্ষার, অনুষঙ্গ।

প্রদত্ত শব্দ	যে নিয়মে মূর্ধন্য-ষ হয়েছে

## ১০. শব্দার্থ

### একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ

ভাষার রহস্যের কোনো শেষ নেই। বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলো বাক্যে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এ শ্রেণির শব্দগুলোকে ভিন্নার্থক শব্দ বলে। যেমন : ‘কাপড়টির রং কাঁচা’, ‘কাঁচা আম খেতে টক’- এ ক্ষেত্রে ‘কাঁচা’ শব্দটি ভিন্ন দুটি বাক্যে যথাক্রমে ‘অস্থায়ী’ ও ‘অপকৃ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও অর্থের বিস্তারে ভিন্নার্থক শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনন্ধীকার্য। আভিধানিক অর্থের বাইরে পদের এ ধরনের বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ অর্থের ক্ষেত্রে নানা ধরনের ব্যঙ্গনা সৃষ্টি করে। নিচে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখানো হলো :

#### অঙ্ক

১. অঙ্ক (গণিত) : যুথি অঙ্কে কাঁচা।
২. অঙ্ক (নাটকের অংশবিশেষ) : নাটকটি পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত।
৩. অঙ্ক (রেখা) : অঙ্ক-পাত করে সাদা খাতাটি নষ্ট করো না।
৪. অঙ্ক (সংখ্যা) : টাকার অঙ্ক কত হবে?

#### অর্থ

১. অর্থ (টাকাকড়ি) : অর্ধই অনর্থের মূল।
২. অর্থ (উদ্দেশ্য) : আমার কাছে আসার অর্থ কী?
৩. অর্থ (অর্থ-উপার্জনে সহায়ক) : পাট বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল।

#### উঠা

১. উঠা (উদিত হওয়া) : ‘পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত-লাল রক্ত লাল’।
২. উঠা (জাগা) : ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নাও।
৩. উঠা (আরোহণ) : পর্বত শৃঙ্গে উঠা খুবই কষ্টকর।

#### কথা

১. কথা (অঙ্গীকার) : কথা দিয়ে কথনো কথা ভঙ্গ করো না।
২. কথা (উপদেশ) : জগনী-গুণীর কথা সকলেরই মেনে চলা উচিত।

৩. কথা (অনুরোধ) : আমার পক্ষে তোমার কথা রাখা সম্ভব নয়।

৪. কথা (প্রসঙ্গ) : কাজের কথা বললেই তুমি চুপ করে থাক।

### কাজ

১. কাজ (চাকরি) : দায়িত্বহীনতার জন্য তার কাজটি গেছে।

২. কাজ (সুফল) : তোমার উপদেশে আমার বড়ই কাজ হয়েছে।

৩. কাজ দেওয়া (চাকরি দেওয়া) : কাজ দিয়ে আপনি আমার বড় উপকার করেছেন।

৪. কাজ (কারুকার্য) : পাথরের উপর কী অপূর্ব কাজ!

### কাঁচা

১. কাঁচা (অপকৃ) : আমগুলো এখনো কাঁচা।

২. কাঁচা (অসিদ্ধ) : আদিম মানুষেরা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করত।

৩. কাঁচা (অপটু) : চিঠিটা কাঁচা হাতের লেখা।

৪. কাঁচা (অস্থায়ী) : কাপড়টির রং একেবারেই কাঁচা।

৫. কাঁচা (মাটির তৈরি) : কাঁচা ঘর-বাড়ি বন্যায় টেকে না।

### কান

১. কান (অঙ্গবিশেষ) : তার কান দুটি যেন খরগোশের কানের মতো খাড়া।

২. কান কাটা (নির্লজ্জ) : লোকটি কান কাটা স্বভাবের।

৩. কান পাতা (আড়ি দেওয়া) : কারো কথায় কান পাতা ঠিক নয়।

### গা

১. গা (গাত্র, শরীর) : গরমে সারা গাঁথে ঘামাচি উঠেছে।

২. গা কাঁপা (ভয় বোধ করা) : ছিনতাইকারীর খঙ্গরে পড়ে তার গা কাঁপছে।

৩. গা জ্বালা করা (ক্রোধের উদ্বেক হওয়া) : মিথ্যা অভিযোগে গা জ্বালা করছে।

৪. গা ঢাকা দেওয়া (পলায়ন করা) : পুলিশের ভয়ে সন্ত্রাসীরা গা ঢাকা দিয়েছে।

### চলা

১. চলা (অগ্সর হওয়া) : সৈন্যদল জোর কদমে এগিয়ে চলছে।

২. চলা (অতিবাহিত হওয়া) : সময় অলক্ষে চলে যায়।

৩. চলা (জীবন নির্বাহ করা) : অল্প আয়ে চলা খুব কঠিন।

### চোখ

১. চোখ রাখা (দৃষ্টি রাখা) : ছেলেটির ওপর চোখ রেখো।
২. চোখ ঝঠা (রোগ বিশেষ) : চোখ ঝঠাতে সে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।
৩. চোখ খোলা (সতর্ক হওয়া) : যা দিনকাল পড়েছে চোখ খোলা রাখা ছাড়া উপায় নেই।
৪. চোখ রাখানো (রাগ দেখানো) : আমাকে চোখ রাখিয়ে লাভ নেই।
৫. চোখের বালি (চক্ষুশূল) : মেয়েটি সুর্মার চোখের বালি।

### ছাড়া

১. ছাড়া (থামা) : তিন দিন পর তার জুর ছেড়েছে।
২. ছাড়া (যাত্রা করা) : খুব ভোরেই সিলেটের উদ্দেশ্যে পারাবত ট্রেনটি ছাড়ে।
৩. ছাড়া (নিরাশ হওয়া) : ওর ব্যাপারে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি।
৪. ছাড়া (ভাকে দেওয়া) : গতকাল চিঠিটা ছাড়া হয়েছে।

### পড়া

১. পড়া (অধ্যয়ন করা) : মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলে অবশ্যই ভালো ফল করতে পারে।
২. পড়া (ক্ষমা অর্থে) : পায়ে পড়ি এবার আমাকে মাফ করে দিন।
৩. পড়া (কমে আসা) : এত দিনে তার রাগ পড়েছে।

### পা

১. পা চাটা (অতি হীনভাবে তোষায়োদ করা) : সমাজে পা চাটা লোকের অভাব নেই।
২. পা বাড়ানো (যেতে উদ্যত হওয়া) : তারা বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।
৩. পায়ে ধরা (বিনীতভাবে অনুরোধ করা) : আপনার পায়ে ধরছি আমার কাজটি করে দিন।
৪. পা (চরণ, পদ) : বল খেলতে গিয়ে টুটুল পায়ে ব্যথা পেয়েছে।

### পাকা

১. পাকা (পক্ত) : ‘পাকা জামের মধুর রসে রঙিন করি মুখ।’
২. পাকা (অভিজ্ঞ) : তিনি একজন পাকা লোক।
৩. পাকা (ঝানু হওয়া) : অল্প বয়সেই ছেলেটি বুদ্ধিতে পেকেছে।

৪. পাকা (স্থায়ী) : শাড়িটার রঙ পাকা।

৫. পাকা (ইটের তৈরি) : পাকা বাড়িঘর বেশি দিন টেকে।

### ফল

১. ফল (উদ্ধিদজ্ঞাত শস্য) : জৈষ্ঠ মাসে প্রচুর ফল পাওয়া যায়।

২. ফল (লাভ, কোনো কাজের পরিণাম) : ‘কি ফল লভিনু হায়।’

৩. ফল (কার্যসিদ্ধি) : অব্যাহত চেষ্টায় ফললাভ হবেই।

৪. ফল (ফলন) : লিচুগাছে এবার খুব ফল ধরেছে।

### বড়

১. বড় (বৃহৎ) : জাহাজটি বেশ বড়।

২. বড় (শ্রেষ্ঠ) : নিজেকে সব কাজে বড় মনে করা ঠিক নয়।

৩. বড় (সন্ত্রান্ত) : নীপা খুব বড় বংশের মেয়ে।

### মন

১. মন (মনোযোগ) : মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত।

২. মন বসা (ভালো লাগা) : এত দিনে তার লেখাপড়ায় মন বসেছে।

৩. মন কর্ষাকৰ্ষি (মনোমালিন্য) : অনেক দিন যাবৎ তাদের দুই বস্তুর মধ্যে মন কর্ষাকৰ্ষি চলছে।

৪. মনেঞ্চাণে (ঐকান্তিকভাবে) : মনেঞ্চাণে দেশকে ভালোবাসা উচিত।

### মাথা

১. মাথা (মেধা, বুদ্ধি) : ছেলেটির বেশ মাথা আছে।

২. মাথা (আগা) : গাছের মাথায় পাথিরা বাসা করেছে।

৩. মাথা (শ্রেষ্ঠ) : বুদ্ধিজীবীরা দেশের মাথা

৪. মাথা (মস্তক, শির) : অন্যায়ের কাছে কথনোই মাথা নোয়াবে না।

৫. মাথা ধরা (শিরঃপীড়া) : হঠাৎ করে খুব মাথা ধরেছে।

### মুখ

১. মুখ (বদন, আনন) : লক্ষ্মার রাজা রাবণের দশ মুখ।

২. মুখ (প্রবেশ পথ) : একসময় তারা গুহা মুখে গিয়ে পৌছাল।

৩. মুখ (সূচনা) : কাজের মুখে বাধা দিয়ো না।
৪. মুখ ফোলানো (অভিমান) : মেয়েটি কথায় কথায় মুখ ফুলায়।
৫. মুখ রাখা (মান রাখা) : এ ছেলে একদিন বংশের মুখ রাখবেই।

### হাত

১. হাত (প্রভাব) : গ্রামের লোকের ওপর তার হাত আছে।
২. হাত করা (বশে আনা) : মাতব্বর টাকা দিয়ে তাকে হাত করেছে।
৩. হাত পাতা (ভিক্ষা করা) : হাত পাতা খুবই ঘৃণার কাজ।
৪. হাতবদল (হস্তান্তর) : এ জমিটি বহুবার হাতবদল হয়েছে।
৫. হাতপাকা (দক্ষ) : সেলাইয়ের কাজে তিনি একজন হাতপাকা লোক।

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

১। নিচের কোন বাক্যে কাঁচা অর্থ অপকৃত ?

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| ক. চিঠিটা কাঁচা হাতের লেখা | খ. কাপড়টির রং একেবারেই কাঁচা    |
| গ. আমগুলো এখনো কাঁচা       | ঘ. কাঁচা ঘরবাড়ি বন্যায় টেকে না |

২। নিচের কোন বাক্যে হাত শব্দটি ভিক্ষা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| ক. হাত পাতা খুবই ঘৃণার কাজ       | খ. জামাটি বহু হাত বদল হয়েছে |
| গ. গ্রামের লোকের ওপর তার হাত আছে | ঘ. মাঝির হাত পাকা            |

#### কর্ম-অনুশীলন

কাঁচা, কান, মাথা, হাত, উঠা-এ শব্দগুলো দ্বারা প্রত্যেকটির তিনটি করে ভিন্নার্থে প্রয়োগ দেখাও :

#### বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা

বাংলা ভাষার শব্দভাষারে এমন কতকগুলো শব্দ আছে, অর্থ ও ভাবের দিক থেকে যেগুলোর রয়েছে বিপরীত অর্থজ্ঞাপক রূপ। যার মাধ্যমে আমরা প্রদত্ত শব্দটির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বুঝে থাকি।

যেমন : ‘আলো বলে, অঙ্ককার তুই বড় কালো।’

‘কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর?’

‘উত্তম নিশ্চিতে চলে অধমের সাথে।’

‘উত্তর্ধ গগনে বাজে মাদল ‘নিম্নে উত্তলা ধরণী তল।’

উল্লিখিত বাক্যসমূহে আলো, স্বর্গ, উত্তম, উত্তর্ধ শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ হলো যথাক্রমে : অঙ্ককার, নরক, অধম ও নিম্ন। সুতরাং একটি শব্দের বিপরীত অর্থবোধক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে।

বিপরীতার্থক শব্দ রচনাকে সুন্দর করে এবং ভাব প্রকাশের মাধ্যুর্য বৃদ্ধি করে বক্তব্যকে প্রবাহমান সৌন্দর্য দান করে। মোটকথা, মনের ভাব সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের জন্য এবং ভাষার সৌন্দর্য পরিবর্ধনের প্রয়োজনে বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নিচে কতিপয় শব্দের বিপরীতার্থক রূপ প্রদত্ত হলো :

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অগ্র	পশ্চাত	অধম	উত্তম	অনুকূল	প্রতিকূল
অনন্ত	সান্ত	অধীন	স্বাধীন	অঙ্গ	বিঙ্গ
অর্পণ	গ্রহণ	অর্থ	অনর্থ	অনুরাগ	বিরাগ
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ	অনুরক্ত	বিরক্ত	অর্জন	বর্জন
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	অজ্ঞান	সজ্ঞান	অসীম	সসীম
আকাশ	পাতাল	আদান	প্রদান	আকর্ষণ	বিকর্ষণ
আগমন	নির্গমন	আকুঝণ	প্রসারণ	আদর	অনাদর
আদি	অন্ত	আয়	ব্যয়	আবির্ভাব	তিরোভাব
আবৃত	অনাবৃত	আমদানি	রঞ্জনি	আপন	পর
আসল	নকল	আত্মীয়	অনাত্মীয়	আস্তিক	নাস্তিক
ইন্দ্রিয়	অতীন্দ্রিয়	আবশ্যক	অনাবশ্যক	ইহলোক	পরলোক
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	ঈর্ষা	প্রীতি	উচিত	অনুচিত
কোমল	কঠিন	উর্বর	অনুর্বর	ঐচ্ছিক	আবশ্যিক
কৃত্রিম	আসল	কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	কৃৎসিত	সুন্দর
ক্রয়	বিক্রয়	কর্কশ	কোমল	ক্ষ	স্তুল
ক্রেশ	আরাম	ক্ষণ	দয়ালু	কৃৎসা	প্রশংসা
ক্ষুদ্র	বৃহৎ	ক্ষয়িক্ষণ	বর্ধিক্ষণ	ক্ষীণ	পুষ্ট

গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	গৃহী	সন্ন্যাসী	গুপ্ত	প্রকাশিত, ব্যক্তি
জগত	নিদ্রিত	জঙ্গম	স্থাবর	জটিল	সরল
ভূলত্ত	নিভৃত	জোয়ার	ভাটা	জ্যোৎস্না	অন্ধকার
তিক্ত	মধুর	তিরক্ষার	পুরক্ষার	তীক্ষ্ণ	ভোঁতা
দীর্ঘ	হৃষ	দাতা	গ্রহীতা	দুর্দিন	সুদিন
দ্যুলোক	ভূলোক	ধার্মিক	পাপিষ্ঠ	ধনী	দরিদ্র
ন্যূন	অধিক	নশ্বর	অবিনশ্বর/শাশ্বত	নবীন	প্রবীণ
নিঃশ্঵াস	প্রশ্বাস	নিরক্ষর	সাক্ষর	নীরস	সরস
প্রাচ্য	প্রতীচ্য	প্রশস্তি	নিন্দা	প্রসারণ	সংকোচন
পার্থিব	অপার্থিব	পূর্ব	পশ্চিম	পশ্চিত	মূর্খ
পূর্ণ	শূন্য	পুষ্ট	ক্ষীণ	ব্যর্থ	সফল
ব্যষ্টি	সমষ্টি	বর্ধমান	ক্ষীয়মান	বন্ধন	মুক্তি
ভদ্র	অভদ্র	ভর্তসনা	প্রশংসা	ভৃত্য	প্রভু
মহৎ	নীচ	মহার্ঘ	সুলভ	মুক	বাচাল
লাভ	ক্ষতি	শক্র	মিত্র	শীতল	উষণ
শিষ্ট	অশিষ্ট	শোক	আনন্দ	শীত	গ্রীষ্ম
শ্রী	বিশ্রী	সরল	বক্ত	সাকার	নিরাকার
সুশ্রী	কৃশ্রী	স্বাধীন	পরাধীন	সংপ্রয়	অপচয়
সিক্ত	শুক্ত	স্বর্গ	নরক	সূক্ষ্ম	স্তুল
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র	স্থাবর	অস্থাবর	সুলভ	দুর্লভ
হৃষ	দীর্ঘ	হৰ্ষ	বিষাদ	হলত	অকারান্ত

## বিপরীতার্থক শব্দ ঘারা বাক্যগঠন :

	মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ		বাক্যে প্রয়োগ
১.	অগ্র	পশ্চাত	:	এ ব্যাপারে অগ্র-পশ্চাত বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
২.	অর্পণ	গ্রহণ	:	একজন দায়িত্ব অর্পণ করলেন আরেকজন দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।
৩.	আকাশ	পাতাল	:	তার কথা ও কাজে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।
৪.	আদি	অন্ত	:	তোমার কথার আদি-অন্ত কিছুই বুঝতে পারলাম না।
৫.	আসল	নকল	:	ভেজালে বাজার ছেয়ে গেছে, আসল-নকল চেনাই মুশকিল।
৬.	কোমল	কঠিন	:	তার স্বভাব যেমন কোমল তেমনি কঠিন।
৭.	ক্রয়	বিক্রয়	:	বিদেশি পণ্যে বাজার সয়লাব, দেশি পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় তেমন একটা নেই।
৮.	তিক্ত	মধুর	:	জীবনে তিক্ত-মধুর বহু অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত থাকে।
৯.	অর্থ	অনর্থ	:	অর্থ অনর্থের মূল।
১০.	আয়	ব্যয়	:	আয় বুঝে ব্যয় করা উচিত।

## অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

১। অনুরাগ এর বিপরীত শব্দ কোনটি ?

ক. রাগান্বিত

খ. রাগের প্রকাশ

গ. বিরাগ

ঘ. অনুরক্ত

## কর্ম-অনুশীলন

১। মূল শব্দের বিপরীতে শূন্য ঘরে সঠিক বিপরীতার্থক শব্দটি ডান পাশ থেকে বেছে নিয়ে লেখ :

মূল শব্দ

বিপরীতার্থক শব্দ

অগোছালো বিপরীতার্থক শব্দ

অনুকূল

সরল

অন্ত

বাদশা

<input type="text"/>	আবদ্ধ	অমৃত
<input type="text"/>	উথান	মহাজন
<input type="text"/>	কনিষ্ঠ	প্রতিকূল
<input type="text"/>	কুটিল	শুষ্ক

### সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো শব্দ আছে, যাদের উচ্চারণ এক অথবা প্রায় একই কিন্তু বানান ও অর্থ ভিন্ন। লিখিত রূপ ছাড়া মৌখিক উচ্চারণে এসব শব্দের অর্থ-পার্থক্য নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। যেমন : ‘অন্ন ও অন্য’। ‘অন্ন’ শব্দটির অর্থ হলো ‘ভাত’ আর ‘অন্য’ শব্দটির অর্থ হলো ‘অপর’। এ ধরনের শব্দসমূহকে সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ বলে। ভাবের যথাযথ অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে সমোচ্চারিত শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতনতা আবশ্যিক। কারণ এ ধরনের শব্দের উচ্চারণ এক হলেও বানানে রয়েছে ভিন্নতা এবং প্রতিটি শব্দের মূলও পৃথক। এ জন্য শব্দগুলোর মধ্যে ব্যাপকভাবে অর্থ-পার্থক্য ঘটে।

নিচে উদাহরণ দেওয়া হলো :

- {অংশ (ভাগ) — এ জমিতে তারও অংশ রয়েছে।
- {অংস (কাঁধ) — অংসে বোৰা নিয়ে লোকজন হাটে যাচ্ছে।
- {অন্ন (পশ্চাত) — সকল সৈন্যই অধিনায়কের অনুগমন করল।
- {অণু (বস্ত্র ক্ষুদ্রতম অংশ) — পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে অণু বলে।
- {অন্ন (ভাত) — অন্নাইনে অন্ন দান কর।
- {অন্য (অপর) — অনুগ্রহ করে অন্যদিন দেখা করুন।
- {অবিরাম (অনবরত) — বর্ষার বৃষ্টিধারা অবিরাম ঝরছে।
- {অভিরাম (সুন্দর) — বর্ষার অভিরাম দৃশ্যে মন ভরে যায়।
- {অবিধান (অনিয়ম) — অফিস-আদালত সর্বত্রই অবিধান ছড়িয়ে পড়েছে।
- {অভিধান (শব্দকোষ) অভিধান খুলে শব্দটির অর্থ জেনে নাও।
- {অর্থ (মূল্য) — বইগুলো আমি অর্ধেক অর্ধে কিনেছি।
- {অর্ধ্য (পূজার উপকরণ) — সরস্বতীর পাদমূলে তারা অর্ধ্য নিবেদন করল।
- {অশ্ব (ঘোড়া) — আরবীয় অশ্ব পৃথিবী-শ্রেষ্ঠ।
- {অশ্বা (পাথর) — বাড়িটি মূল্যবান অশ্বা দিয়ে তৈরি।

- { আপণ (দোকান) — ঢাকা শহরের আপণগুলো বেশ সুসজ্জিত ।  
 { আপন (নিজ) — আপন পাঠে মন দাও ।
- { আষাঢ় (মাসবিশেষ) — আষাঢ় মাস, চারদিকে হৈ হৈ পানি ।  
 { আসার (প্রবল বৃষ্টিপাত) — বর্ষার আসারে মাঠ-ঘাট প্লাবিত হলো ।
- { উপাদান (উপকরণ) — পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক উপাদান দিয়ে তৈরি ।  
 { উপাধান (বালিশ) — শিশুটি উপাধানে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে ।
- { কুজন (খারাপ ব্যক্তি) — কুজনের সংসর্গ পরিত্যাজ্য ।  
 { কুজন (পাখির ডাক) — পাখির কুজনে তাদের ঘূম ভাঙল ।
- { কোণ (দুই সরলরেখার মিলনস্থান, দিক) — ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ ।  
 { কোন (অনির্ধারিত কোনোটি) — তারা কোন দিকে গিয়েছে জানি না ।
- { কপাল (ললাট, মাথার খুলি) — কপালের লিখন যায় না খণ্ডন  
 { কপোল (গাল) — ‘কপোল ভিজিয়া গেল নয়নের জলে ।’
- { কমল (পদ্ম) — ঝিলের জলে কমল ফুটে আছে ।  
 { কোমল (নরম) — ‘কোমল চৱণ আলতা ধোয়া ।’
- { কুল (বৎশ) — মেয়েটির মাতৃকুল খুবই সন্তুষ্ট ।  
 { কুল (নদীর তীর) — পদ্মার কুলেই তাদের গ্রাম ।
- { গৌ (গ্রাম) — ‘ঐ দেখা যায় তালগাছ ঐ আমাদের গৌ ।’  
 { গো (শরীর) — মেয়েটির গোঁয়ে লাল জামা বেশ মালিয়েছে ।
- { জ্যোষ্ঠ (অগ্রজ) — তার জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা একজন শিক্ষক ।  
 { জ্যোষ্ঠ (মাসবিশেষ) — ফলের প্রাচুর্যে জ্যোষ্ঠ মাস মধুমাস নামে পরিচিত ।
- { দিন (দিবস) — সাত দিনে এক সপ্তাহ তিরিশ দিনে এক মাস ।  
 { দীন (দৰিদ্র) — দীনে দয়া কর ।
- { দ্বীপ (জলবেষ্টিত স্থান) — সেন্ট মার্টিন দ্বীপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি ।  
 { দ্বিপ (হাতি) — পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গলে বন্য দ্বিপ আছে ।
- { নীর (জল) — বর্ণার নীর খুবই স্বচ্ছ ও সুপেয় ।  
 { নীড় (পাখির বাসা) — পাখিরা এখন নীড় রচনায় ব্যস্ত ।
- { পানি (জল) — পানির স্তর ক্রমশই নিচে নেমে যাচ্ছে ।  
 { পাণি (হাত) — সরস্বতী দেবীর পাণিতে বীণা শোভমান ।

{বিনা (ব্যতীত) — ‘দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?’

{বীণা (বাদ্যযন্ত্র) — তিনি একজন প্রখ্যাত বীণাবাদক।

{ভাসা (ভাসমান থাকা) — জেলে নৌকাগুলো জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে।

{ভাষা (ভাব প্রকাশক উক্তি বা সংকেত) — মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা।

{ভারি (খুব) — বর্ণার বৃপ্ত ভারি মনোমুক্তকর।

{ভারী (বেশি ওজন) — অতটুকু ছেলের মাথায় অত ভারী বোবা চাপিয়েছে কেন?

{মুখ (মুখমণ্ডল) — মুখ ভার করে বসে আছ কেন?

{মুক (বোবা) — মেয়েটি জন্ম থেকেই মুক।

{ঘতি (বিরাম স্থান) — ঘতি হলো বাক্যের অর্থ ঠিক ঠিক বোঝানোর জন্য বিরাম স্থান।

{ঘতী (মুনি, সন্ধ্যাসী) — ঘতীগণ সংসার ত্যাগ করে নির্জনে পরমেশ্বরের ধ্যান করেন।

{লক্ষ (শত সহস্র) — একশ সহস্রে এক লক্ষ।

{লক্ষ্য (উদ্দেশ্য) — সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া জীবনে সফলকাম হওয়া যায় না।

{শয্যা (বিছানা) — জীবন কুসুম-শয্যা নয়, বাধা-বিঘ্ন পেরিয়েই পথ চলতে হয়।

{সজ্জা (বেশভূষা) — মেয়েটি নতুন সজ্জায় লজ্জা পাচ্ছে।

{শুচি (পবিত্র) — সুচিভা ছাড়া মন শুচি হয় না।

{সুচি (বিষয় তালিকা) — বইয়ের শুরুতে সুচিটা দেখে নাও।

{স্বর্গ (দেবলোক) — কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর?

{সর্গ (অধ্যায়, পরিচ্ছেদ) — বইটিতে দশটি সর্গ আছে।

{সাক্ষর (অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন) — নিরক্ষর জনগণকে সাক্ষর করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

{স্বাক্ষর (সই, দন্তখত) — দরখাস্তে আবেদনকারীর স্বাক্ষর নেই।

### কর্ম-অনুশীলন

নিচের সমোচ্চারিত শব্দগুলোর অর্থের পার্থক্য দেখাও :

প্রদত্ত শব্দ	অর্থ	প্রদত্ত শব্দ	অর্থ
{অণ অনু		{শয়া সজ্জা	
{দিন দীন		{লক্ষ লক্ষ্য	
{দ্বিপ দ্বীপ		{নীড় নীর	
{পাণি পানি		{অশ্ব অশ্যা	

#### এক কথায় প্রকাশ

বাক্য ভাষার বৃহত্তম একক। আমরা কথা বলার সময় কিংবা লেখার সময় অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো বাক্য বা বাক্যাংশকে সংক্ষিপ্ত করে থাকি। একাধিক পদ, এমনকি একটি পূর্ণ বাক্যকেও অনেক সময় একটি শব্দে প্রকাশ করা যায়। একাধিক পদকে সংক্ষিপ্ত করে একটি পদে প্রকাশ করার রীতিকে এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন বলে। বস্তুত, বহুপদকে একপদে পরিণত করার মধ্য দিয়ে বাক্য বা বাক্যাংশের সংকোচন কাজ সম্পন্ন হয়।

ভাষাবিদ মূলীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে, ‘একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে বাক্য সংক্ষেপণ বলে। এটি বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশেরই নামান্তর।’

**সংজ্ঞার্থ:** অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্য বা বাক্যাংশকে সংকুচিত করে প্রকাশ করাকে বা একপদে পরিণত করাকে বাক্য সংকোচন বলে।

বাক্য সংকোচনের ফলে বাক্য সংক্ষিপ্ত ও শ্রুতিমধুর হয়। সংক্ষেপে ও সংহতভাবে ভাব প্রকাশ করা হলে রচনার গুণ বা মান বৃদ্ধি পায়। নিচের অংশটুকু লক্ষ করি :

বসন্তকালের দিনের শেষ ভাগ। সামনে জনবিল বিশাল প্রাঞ্চির। দমন করা যায় না এমন উৎসাহ সবার মনে। কিছুক্ষণ চলতেই আমরা চার রাস্তার মিলনস্থলের দেখা পেলাম। একতারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে একজন বাটুল আসছেন।

উপরের বর্ণনায় যেসব শব্দ ঘোটা করে দেওয়া আছে, সেগুলোকে সংক্ষেপে প্রকাশ করে দেখি কেমন হয় :

১০ বসন্তকালের অপরাহ্ন। সামনে তেপাঞ্চ। অদম্য উৎসাহ সবার মনে। কিছুক্ষণ চলতেই আমরা চৌরাস্তার দেখা পেলাম। একতারা বাজিয়ে একজন বাটুল আসছেন।

লক্ষণীয়, উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ও শুতিমধুর হয়েছে।

### বাক্য সংকোচনের নিয়ম

বাক্য বা বাক্যাংশ একাধিক পদের সমষ্টি। একাধিক পদকে একপদে পরিণত করাই বাক্য সংকোচন। নিচের রীতিগুলো অবলম্বন করে বাক্য সংকোচন করা হয় :

১. প্রত্যয়যোগে বাক্য সংকোচন : ডুবে যাচ্ছে যা — ডুবন্ত ( $\sqrt{\text{ডুব}} + \text{অন্ত}$ )। এখানে (' $\sqrt{\text{ডুব}}$ ') ক্রিয়া-প্রকৃতির সঙ্গে 'অন্ত' প্রত্যয়যোগে 'ডুবন্ত' শব্দটি তৈরি হয়েছে।
২. সমাসযোগে বাক্য সংকোচন : পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক (অব্যয়ীভাব সমাস)। শত অন্দের সমাহার = শতান্তী (বিশেষ সমাস)।
৩. আভিধানিক শব্দের সাহায্যে বাক্য সংকোচন : ময়ূরের ডাক = কেকা। হরিণের চামড়া = অজিন। অলংকারের ঝঁকার = শিঞ্জন।

### বাক্য সংকোচনের কতিপয় উদাহরণ :

অক্ষির সমক্ষে বর্তমান — প্রত্যক্ষ

অকালে পক্ষ হয়েছে যা — অকালপক্ষ

আয় বুঝে ব্যয় করে যে — মিতব্যয়ী

ইতিহাস রচনা করেন যিনি — ঐতিহাসিক

ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার — আঁষটে

উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে — কৃতজ্ঞ

উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না — অকৃতজ্ঞ

কোনো ক্রমেই যা নিবারণ করা যায় না — অনিবার্য

চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত — চাক্ষুষ

জীবিত থেকেও যে মৃত — জীবন্ত

নষ্ট হওয়াই স্বত্বাব যার — নশ্বর

পা থেকে মাথা পর্যন্ত — আপাদমস্তক

মৃতের মতো অবস্থা যার — মুমুর্শু

যা পূর্বে ছিল এখন নেই — ভূতপূর্ব

যা দীনি পাচ্ছে — দেদীপ্যমান

যা জলে ও স্তুলে চরে — উভচর

যা অতি দীর্ঘ নয় — নাতিদীর্ঘ

যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না — বর্ণচোরা

যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু — বন্ধুর

যা ক্রমশ বৰ্ধিত হচ্ছে — বৰ্ধিষ্ঠু

যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না — বনস্পতি

যে রোগ নির্গং করতে হাতড়ে ঘরে — হাতড়ে

যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে — পৱগাছা

যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে — অবিমৃশ্যকারী

যে বন হিস্ব জন্মতে পরিপূর্ণ — শাপদসংকুল

যিনি বক্তৃতা দানে পটু — বাগী

সমুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা — প্রত্যুদ্গমন

হনন করার ইচ্ছা — জিঘাংসা

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

১। “কোথাও উঁচু কোথাও নিচু” এক কথায় প্রকাশ করলে কী হয় ?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. বন্ধুর | খ. উঁচু-নিচ |
| গ. অসমতল  | ঘ. অমসৃণ    |

২। যিনি বক্তৃতা দানে পটু-তাকে এক কথায় কী বলে ?

- |          |            |
|----------|------------|
| ক. বক্তা | খ. বাচাল   |
| গ. বাগী  | ঘ. মিতভাযী |

### কর্ম-অনুশীলন

১। বাম পাশের বাক্যগুলোর সঙ্গুচিত রূপ ডান পাশের ঘরে বসাও।

প্রদত্ত বাক্য	সঙ্গুচিত রূপ
১. অঢ়ে জন্মেছে যে	
২. জয় করার ইচ্ছা	
৩. উপকার করার ইচ্ছা	
৪. জয়সূচক উৎসব	
৫. ঘধু পান করে যে	
৬. যিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত	
৭. শুভক্ষণে জন্ম ঘার	
৮. ঘার মরণাপন্ন অবস্থা	
৯. প্রিয় কথা বলে যে (নারী)	
১০. হাতির ডাক	

### বাগ্ধারা

বাগ্ধারা মূলত বিশিষ্ট অর্থবোধক একধরনের বাক্যাংশ বা শব্দগুচ্ছ। ‘বাগ্ধারা’ শব্দের অর্থ কথা বলার ‘বিশেষ চং’ বা ‘রীতি’। বাগ্ধারার সাহায্যে বিশেষ ধরনের অর্থবোধক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ গঠিত হয়। বাগ্ধারা ইংরেজি ‘ইডিয়ম’ (Idiom) শব্দের সমার্থক।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই বিশিষ্টার্থবোধক শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বাংলাতেও অজস্র বাগ্ধারা আছে। বাংলা ভাষার অনেক শব্দই তাদের নিজস্ব অর্থ ছাড়াও বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইঙ্গিতবহু ও সূক্ষ্ম তাৎপর্যমণ্ডিত। যেমন : ‘অর্ধচন্দ্ৰ’ বলতে ‘অর্ধেক চাঁদ’ না বুঝিয়ে ‘গলাধাকা’ বোঝায়। অনুরূপ ‘তাসের ঘর’ বলতে ‘তাস দ্বারা নির্মিত ঘর’ না বুঝিয়ে ‘ক্ষণস্থায়ী’ কোনো কিছুকে বোঝায়। সুতরাং আক্ষরিক অর্থকে ছাপিয়ে যখন কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে বাগ্ধারা বলে।

বাগ্ধারা ভাষা ব্যবহারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। এর নেপথ্যে ব্যক্তিক ও সামাজিক নানা ঘটনা বা প্রসঙ্গ যুক্ত হয়ে থাকে। বাগ্ধারা ভাষার একটি গৌরবময় ঐতিহ্য। যে জাতির ভাষা যত প্রাচীন, সে জাতির ভাষায় বাগ্ধারার ব্যবহার তত বেশি। বাংলা ভাষার হাজার বছরের ঐতিহ্য রয়েছে। তাই বাঙালির মননগত অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য অজস্র বাগ্ধারা সৃষ্টি হয়েছে।

বাগ্ধারা ভাষার সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক। অর্থের স্পষ্টতায়, ভাবের ব্যঙ্গনায়, বক্তব্যের আকর্ষণ সৃষ্টিতে বাগ্ধারার শুভত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাগ্ধারার যথাযথ প্রয়োগে ভাষা সুলিলিত, সুষমামণ্ডিত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

**নিচে সুপ্রচলিত কতকগুলো বাগ্ধারার বাক্যে প্রয়োগ দেখানো হলো :**

**অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) –** সমিতির জন্য কৃপণ কামাল মিয়ার কাছে চাঁদা চাওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র।

**অঙ্কা পাওয়া (মরে যাওয়া) –** গণপিটুনিতে পকেটমার অঙ্কা পেল।

**অর্ধচন্দ্র (গলাধাকা) –** বেয়াদব ছেলেটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও।

**অগাধ জলের মাছ (সুচতুর ব্যক্তি) –** চৌধুরী সাহেব অগাধ জলের মাছ, তাঁর মারপঁয়াচ ধরা মুশকিল।

**আমডা কাঠের টেকি (অপদার্থ) –** তুমি হলে আমডা কাঠের টেকি, তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না।

**আক্কেল সেলামি (বোকামির দঙ্গ) –** বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে পলাশকে পথঝাশ টাকা আক্কেল সেলামি দিতে হলো।

**আঘাতে গল্প (আজগুবি গল্প) –** এসব যে তোমার আঘাতে গল্প, তা আমাদের জানা হয়ে গেছে।

**উড়নচষ্টী (অমিতব্যয়ী) –** ছেলেটা উড়নচষ্টী না হলে পৈতৃক সম্পত্তি দুদিনেই নিঃশেষ করে দেবে কেন?

**ইন্দুর কপালে (মন্দভাগ্য) –** ফরহাদ ইন্দুর কপালে, তাই তো টাঁকশালের চাকরিটা হয়েও হলো না।

**ইচড়ে পাকা (অকালপক্ষ) –** ছেলেটা ইচড়ে পাকা বলেই তো বড়দের সঙ্গে অমন করে তর্ক করছে!

**এলাহি কাও (বিরাট ব্যাপার) –** পুতুলের বিয়েতে এত বড় আয়োজন-এ দেখছি এলাহি কাও।

**কলুর বলদ (একটানা খাটুনি) –** কলুর বলদের মতো সৎসারের পিছে সারা জীবন খাটলাম, কিন্তু লাভের লাভ কিছুই পেলাম না।

**কৈ মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে না) –** চোরটার কৈ মাছের প্রাণ, গণপিটুনি খেয়েও বেঁচে গেল।

**খয়ের ঝাঁ (চাটুকার) –** তুমি তো বড় সাহেবের খয়ের ঝাঁ, তোমার পদোন্নতি তো হবেই।

**গৌফ খেজুরে (অলস) –** গৌফ খেজুরে লোকের পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয়।

**গোড়ায় গলদ (শুরুতে ভুল) –** এ অঙ্ক মিলবে না, কারণ গোড়াতেই তো গলদ রয়েছে।

**গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য) –** আশা করেছিলাম বিদেশে যাব, এখন দেখছি সে গুড়ে বালি।

**ঘোড়ার ডিম (অবাস্তব বস্তু) –** পড়াশোনায় মনোযোগী না হলে পরীক্ষায় ঘোড়ার ডিম পাবে।

**চোখের বালি (অপ্রিয় / চক্ষুশূল লোক) –** মা-মরা ছেলেটি সৎ মায়ের চোখের বালি।

**টনক নড়া** (চেতন্যোদয় হওয়া) – প্রথম সাময়িক পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় তার টনক নড়ল।

**ঠোঁট কাটা** (স্পষ্টভাবী) – আফাজ মিএগার মুখে কিছুই আটকায় না, ঠোঁট কাটা যাকে বলে।

**ডুমুরের ফুল** (অদ্র্শ্য বস্তু) – চাকরি পেয়ে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে যে— দেখাই পাওয়া যায় না।

**চাকের কাঠি** (মোসাহেব) – তুমি তো বড় সাহেবের চাকের কাঠি, তিনি যা বলেন তুমি ও তাই বল।

**তীর্থের কাক** (সাগ্রহে প্রতীক্ষাকারী) – প্রবাসী ছেলের বাড়ি ফেরার প্রতীক্ষায় বাবা-মা তীর্থের কাকের মতো বসে আছেন।

**ধ বনে যাওয়া** (স্তুতি হওয়া) – তার কাণ দেখে আমি তো ধ বনে গেলাম।

**দহরম মহরম** (ঘনিষ্ঠতা) – ম্যানেজারের সঙ্গে আজমল সাহেবের খুব দহরম মহরম।

**দুধের মাছি** (সুসময়ের বক্স) – টাকা থাকলে দুধের মাছির অভাব হয় না।

**ধামাধরা** (চাটুকারিতা) – সমাজে ধামাধরা লোকের অভাব নেই।

**নয় ছয়** (অপচয়) – জাভেদ জমি বিক্রির টাকাগুলো নয় ছয় করে ফেলল।

**পুকুর চুরি** (বড় রকমের চুরি) – অসাধু কর্মচারীরা পুকুর চুরি করে ব্যবসায় লালবাতি জ্বালিয়েছে।

**বৰখাৰ্মিক/ বিড়াল তপস্থী** (ভণ সাধু) – মুখে নীতিবাক্য আওড়ালেও লোকটা আসলে বৰখাৰ্মিক/বিড়াল তপস্থী।

**ভৱাভূবি** (সর্বনাশ) – দোকানে আগুন লেগে ফজলু মিএগার ভৱাভূবি হয়েছে।

**ভিজে বিড়াল** (কগটচারী) – সে একজন ভিজে বেড়াল, তাকে চেনা সহজ নয়।

**ঘক্ষের ধন** (কৃপণের কড়ি) – ঘক্ষের ধনের মতো সে তার টাকাকড়ি আগলে আছে, কাউকে দুই পয়সার সাহায্যও করে না।

**ৱাষ্পৰ বোয়াল** (সর্বগাসী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি) – উচ্চপদে নিয়োজিত ব্যক্তিরা যদি রাষ্পৰ বোয়াল হয়, তবে দেশের উন্নতি হবে কেমন করে?

**লেফাফাদুরস্ত** (বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি) – আলম মিএগা এমন লেফাফাদুরস্ত যে বাইরে থেকে দারিদ্র্য বোঝা যায় না।

**শাঁখের কৱাত** (উভয় সংকট) – সত্য বললে বাবা বিপদে পড়েন, আর মিথ্যে বললে মা বিপদে পড়েন—আমি পড়েছি শাঁখের কৱাতে।

**শাপে বৱ** (অনিষ্টে ইষ্ট লাভ) – বড় সাহেব হারুনকে শাস্তি না দিয়ে দিলেন প্রমোশন, একেই বলে শাপে বৱ।

**হ-ঘ-ব-ৱ-ল** (বিশ্বজ্ঞলা) – জিনিসপত্র ছড়িয়ে ঘরটাকে তো একেবারে হ-ঘ-ব-ৱ-ল করে রেখেছ।

**হাতের পাঁচ** (শেষ সম্বল) – হাতের পাঁচ এ কটি টাকা দিয়েই আমাকে বাকি কটা দিন চলতে হবে।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (নমুনা)

- ১। ‘কৈ মাছের প্রাণ’ বলতে কী বুঝায়?
- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| ক. যা সহজে মরে না          | খ. এক জাতের মাছ          |
| গ. মাছের প্রাণ স্থায়ী নয় | ঘ. কৈ মাছ খুব শক্তি শালী |
- ২। নিচের কোন বাক্যে অর্ধচন্দ্র বাগ্ধারার সঠিক প্রয়োগ হয়েছে ?
- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ক. বালকটিকে অর্ধচন্দ্র দেখাও।  | খ. চোরটিকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বের কর। |
| গ. আকাশে অর্ধচন্দ্র দেখা যায়। | ঘ. মা শিশুকে অর্ধচন্দ্র দেখাচ্ছেন।  |

## রচনা

### আমাদের জাতীয় পতাকা

**ভূমিকা :** জাতীয় পতাকা একটি স্বাধীন জাতির সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তাই প্রতিটি স্বাধীন দেশ ও জাতিরই একটি জাতীয় পতাকা আছে। জাতীয় পতাকা দেশের সব মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ করে। যেকোনো স্বাধীন দেশ বা জাতি তার জাতীয় পতাকাকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে।

**জাতীয় পতাকার আকার ও আকৃতি :** বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্ত বর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত  $10:6$ । পতাকার দৈর্ঘ্য যদি  $305$  সেন্টিমিটার ( $10$  ফুট) হয়, প্রশ্ন  $183$  সেন্টিমিটার ( $6$  ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ হবে পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। আমাদের জাতীয় পতাকার ডিজাইন করেছেন শিল্পী কামরুল হাসান।

**মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রতীক :** বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এদেশে সকল ধর্মের মানুষের বসবাস রয়েছে। কিন্তু ধর্ম আলাদা হলেও সবার ভেতরে রয়েছে একই জাতিসত্তা। আর তা হলো বাঙালি জাতিসত্তা। বহু ত্যাগের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। লাল-সবুজের পতাকা আমাদের সে স্মৃতিকেই বহন করছে। এ পতাকা আমাদের সংগ্রামের ইতিহাসকে তুলে ধরে সব প্রজন্মের সামনে।

**জাতীয় পতাকার বিশেষত্ব :** আমাদের জাতীয় পতাকার সবুজ রং বাংলাদেশের শ্যামল প্রকৃতির দিকটিকে তুলে ধরেছে। লাল রং তুলে ধরেছে নবজাগরণের কথা। এছাড়া স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এ দেশের মানুষ যে রক্ত দিয়েছে তার ইঙ্গিতও বহন করে লাল রং। মোটকথা, আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে জাতীয় পতাকা।

**জাতীয় পতাকার শুল্কত্ব :** জাতীয় পতাকা আমাদের সকল বৈষম্য দূর করে দেয়। আমরা এ পতাকার ছায়াতলে একত্রে মিলিত হই। আমরা পরম্পরার মধ্যে সকল ভেদাভেদ ভূলে যাই। এছাড়া আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে দেশের জন্য সর্বশ ত্যাগ করার প্রেরণাও আমরা জাতীয় পতাকা থেকে পাই। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অঙ্গগতির সঙ্গে জাতীয় পতাকা গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। হিমালয়ের চূড়া থেকে শুরু করে আমাদের যে কোনো অর্জনেই জাতীয় পতাকা সবার আগে আমাদের হাতে উঠে আসে। আমাদের গৌরবময় ইতিহাসের স্মারক জাতীয় পতাকা। শুধু বর্তমানের নয়, ভবিষ্যতের সকল কর্মপ্রেরণার উৎসও আমাদের জাতীয় পতাকা।

**জাতীয় পতাকার সম্মান :** জাতীয় পতাকার জন্য আমরা গর্ববোধ করি। তাই একে সম্মান করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব। বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। এছাড়া অন্যান্য স্থানে বা অনুষ্ঠানে যখনই জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করা হোক না কেন, তখনই দাঁড়িয়ে তার প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। যে জাতীয় পতাকাকে সম্মান করে না, সে সকলের ঘৃণার পাত্র। তাকে সকলে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে।

**উপসংহার :** জাতীয় পতাকা আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত মর্যাদার ও সম্মানের। বুকের রক্ত দিয়ে হলেও এর সম্মান রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের লক্ষ লক্ষ বীর শহিদ এ পতাকার জন্যই তাঁদের জীবনদান করেছেন। যখন নীল আকাশের মাঝে আমাদের এ পতাকা উড়তে থাকে, তখন তা দেখে গর্বে আমাদের বুক ভরে যায়।

## আমাদের গ্রাম

**ভূমিকা :** সবুজে শ্যামলে ভরা আমাদের এদেশের বেশির ভাগ স্থানজুড়ে রয়েছে গ্রাম। আমাদের এ গ্রামগুলো যেন সবুজের লীলাভূমি। গ্রামের সবুজ প্রকৃতি যেকোনো মানুষের হৃদয়কে প্রশান্তিতে ভরে দেয়। গ্রামের শান্ত পরিবেশ মানুষের সকল ক্লান্তি দূর করে। গ্রামই এদেশের প্রাণ।

**গ্রামের অবস্থান :** আমাদের গ্রামের নাম রতনপুর। এটি ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার অন্তর্গত। এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ইছামতী নদী। নদীর দুপাশের প্রাকৃতিক শোভা এ গ্রামকে অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছে। ঢাকা থেকে সড়ক পথে খুব সহজেই আমাদের গ্রামে আসা যায়।

**গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য :** আমাদের গ্রামখানি ছবির মতো। আম-জাম, কাঁঠাল-লিচু, নারিকেল-সুপারি, শিমুল-পলাশ, তাল-তমাল আর নানাজাতের গাছপালায় সুসজ্জিত আমাদের এই গ্রাম। ঝোপবাড় লতাপাতার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা সবার মন কেড়ে নেয়। পাখপাখালির কলকুজনে সব সময়ই মুখের থাকে গ্রামখানি। দিগন্তবিস্তৃত ফসলের মাঠ, ধান-কাউনের হাতছানি, নিমুম দুপুরে বটের ছায়ায় রাখালের বাঁশি উদাস করে মনপ্রাণ। দিঘী-তোবা, বিল-বিল- কী এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সঞ্চয়!

**গ্রামের মানুষ :** আমাদের গ্রামে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ বাস করে। তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কোনো ভেদাভেদ নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই সব মানুষ এখানে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে।

**গ্রামের মানুষের জীবিকা :** আমাদের গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া কিছু জেলে এবং তাঁতিও এখানে রয়েছে। কিছু মানুষ লেখাপড়া শিখে শহরে চাকরি করে। তবে সে সংখ্যা নিতান্তই কম। এছাড়া কিছু মানুষ দিনমুজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

**গ্রামের অর্থনৈতিক উৎস :** বাংলাদেশের বেশিরভাগ গ্রামের মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল। তবে আমাদের গ্রামের চিত্র একটু ভিন্ন। গ্রামের বেশিরভাগ পরিবারেরই একজন করে দেশের বাইরে থাকে। তাদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা এ গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থাকে মজবুত করেছে। গ্রামের আয়ের আরেকটি বড় উৎস কুটির শিল্প। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই নকশীকাঁথা, উলের তৈরি গালিচা, পাটের তৈরি নানা গৃহসজ্জার পণ্য তৈরি হয়। এগুলো শহরে বিক্রি করে গ্রামের মানুষ প্রচুর অর্থ আয় করে। এছাড়া কৃষিজাত পণ্য যেমন : ধান, পাট, গম ও নানা ধরনের সবজি তরকারি বিক্রি করেও গ্রামের মানুষ অর্থ রোজগার করে। প্রতি বুধবার গ্রামে হাট বসে। হাটে শহরের লোকজন এসে সরাসরি গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিজাত পণ্য সংগ্রহ করে।

**গ্রামের প্রতিষ্ঠান :** আমাদের গ্রামে একটি প্রাথমিক ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ ছাড়া একটি কামিল মাদ্রাসা রয়েছে। আরো রয়েছে একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও দুটি বেসরকারি অফিস। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি মসজিদ, একটি মন্দির ও একটি গির্জা রয়েছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে রয়েছে একটি পোস্ট অফিস।

**গ্রামের সংস্কৃতি :** সাংস্কৃতিকভাবে আমাদের গ্রাম খুবই উন্নত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এখানে নানা ধরনের মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। যেমন : চৈত্র মাসের শেষে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা, বৈশাখ মাসে বৈশাখি মেলা, অদ্বাণ মাসে নবাব্ল অনুষ্ঠান, পৌষ মাসে পিঠার অনুষ্ঠান ইত্যাদি। গ্রামের মুসলিম ও হিন্দু বিয়েতে লোকজ গান, নাচ ও খাবারের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দিবসে স্কুলে অনুষ্ঠানের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবেও লোকজন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

**স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রামের অবদান :** মহান মুক্তিযুদ্ধে এ গ্রামের মানুষের অবদান অনেক। এ গ্রামের মানুষের সাহসিকতা ও বীরত্বে পাকিস্তানি বাহিনী এ গ্রামে প্রবেশের খুব একটা সুযোগ পায়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ অঞ্চলের দুজন আঞ্চলিক কমাত্তার এ গ্রামে থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। পাকিস্তানি বাহিনীর গতি রোধ করার লক্ষ্যে এ গ্রামের এক ছেলে ব্রিজ ধ্বংস করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। তাঁর এবং মুক্তিযুদ্ধে আরো যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের স্মরণে গ্রামে একটি শহিদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে।

**উপসংহার :** আমাদের রতনপুর গ্রাম আমাদের কাছে খুব প্রিয়। এ গ্রামের প্রকৃতি মায়ায় জড়ানো। রতনপুরের মানুষ সহজ-সরল ও অতিথিপরায়ণ। ইছামতী নদীর সৌন্দর্য এ গ্রামকে করেছে অন্য সব গ্রাম থেকে আলাদা। রতনপুর গ্রামের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে।

## দর্শনীয় স্থান

**ভূমিকা :** ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ আমাদের বাংলাদেশ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসক এ দেশকে শাসন করেছেন। তাঁরা তৈরি করেছেন বিভিন্ন সুরম্য প্রাসাদ, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি। এগুলো এখন আমাদের দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া আমাদের দেশ প্রাকৃতিকভাবেও মনোরম। এ দেশের বন, পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল ও আমাদের দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

**বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থান :** বাংলাদেশের ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : দিনাজপুরের কান্তজী মন্দির, নওগাঁর পাহাড়পুর, বগুড়ার মহাস্থানগড়, নাটোরের দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি (উত্তরা গণভবন) ও রানি ভবনীর বাড়ি, পুঁটিয়ার জমিদারবাড়ি, গাজীপুরের ভাওয়াল রাজবাড়ি, ঢাকার আহসান মঞ্জিল, নারায়ণগঞ্জের সোনার গাঁ, কুমিল্লার ময়নামতি ইত্যাদি। প্রাকৃতিক দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : দিনাজপুরের রামসাগর, নাটোরের চলনবিল, নেত্রকোনার বিড়িসিরি, সিলেটের জাফলং, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত ইত্যাদি।

**দর্শনীয় স্থান হিসেবে নাটোর :** রাজশাহী বিভাগের একটি জেলা শহর নাটোর। এর উত্তরে রয়েছে নওগাঁ ও বগুড়া জেলা, দক্ষিণে পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলা, পূর্বে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমে রাজশাহী জেলা।

অবস্থিত। নাটোর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এখানে ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক উভয় ধরনের দর্শনীয় স্থান রয়েছে।

**নাটোরের ঐতিহাসিক স্থান :** ১৮৬৯ সালে নাটোর মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। পরবর্তীতে নাটোর পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত হয়। প্রাচীন শহর হওয়ায় নাটোরে অনেক ঐতিহাসিক স্থাপনা লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি ও ছেটতরফ রাজবাড়ি উল্লেখযোগ্য। রানি ভবানীর কীর্তি নাটোরের মানুষ এখনো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

**রানি ভবানীর কীর্তি :** একজন দক্ষ জমিদার প্রজাদরদি হিসেবে রানি ভবানীর নাম সর্বজনবিদিত। তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজহিতৈষী ও উদার মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি শত শত মন্দির, অতিথিশালা ও রাস্তা নির্মাণ করেন। প্রজাদের পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য তিনি অনেকগুলো পুকুর খনন করেন। তিনি শিক্ষাবিষ্টারে আগ্রহী ছিলেন।

**দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি :** নাটোর শহর থেকে প্রায় ২.৪০ কিলোমিটার দূরে দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি অবস্থিত। রাজা দয়ারাম রায় এ রাজবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ১৮৯৭ সালে নাটোরে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। এতে দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে দেশি-বিদেশি স্থপতি ও শিল্পীদের দ্বারা রাজা প্রমদানাথ রায় রাজবাড়িটি পুনর্নির্মাণ করেন। এ রাজবাড়ি প্রায় ৪৩ একর জমির উপর নির্মিত। সমস্ত রাজবাড়িটি উচ্চ দেয়াল দ্বারা আবৃত। রাজবাড়িতে ঢোকার মুখে একটি সিংহঘার রয়েছে। এ সিংহঘারের দুই প্রান্তে দুটি কামান রয়েছে এবং মাথার উপরে রয়েছে একটি সুদৃশ্য বড় ঘড়ি। মূল ভবনের ভেতরের সাজসজ্জা ও আসবাবপত্র এখনো মানুষকে বিস্মিত করে। ভবনের পেছন দিকে রয়েছে একটি বাগান। এখানে দুষ্প্রাপ্য অনেক গাছ আছে। সমস্ত রাজবাড়িটি একটি গভীর ঝিল দ্বারা পরিবেষ্টিত। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান দিঘাপতিয়া রাজবাড়িকে ‘দিঘাপতিয়া গর্ভনর হাউস’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিঘাপতিয়া রাজবাড়িকে ‘উত্তরা গণভবন’ নামে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

**ছেটতরফ রাজবাড়ি :** নাটোর জেলার বঙ্গজল নামক স্থানে ছেটতরফ রাজবাড়ি অবস্থিত। রাজা চন্দ্রনাথ রায়, যোগেন্দ্রনাথ রায়, জীতেন্দ্রনাথ রায় ও বীরেন্দ্রনাথ রায়ের তত্ত্বাবধানে রাজবাড়িটি পরিচালিত হতো। বর্তমানে এটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে রয়েছে। ছেট তরফের ভেতরে অনেকগুলো গভীর পুকুর রয়েছে। রাজবাড়ির সীমার মধ্যে মন্দির রয়েছে সাতটি। এ ছাড়া দুটি বড় ভবন এবং বেশ কয়েকটি ছেট ভবন রয়েছে।

**চলনবিল :** নাটোরের প্রাকৃতিক দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে চলনবিল একটি। বর্ষার সময় চলনবিল পানিতে ভরে যায়। তখন এর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অনেক পর্যটক এখানে বেড়াতে আসে। চলনবিলের উপর নৌকায় ঘুরে তারা এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে।

**নাটোরের কাঁচাগোল্লা :** ঐতিহাসিকভাবে নাটোরের কাঁচাগোল্লা মিষ্টি সুপ্রসিদ্ধ। দুধ দ্বারা কাঁচাগোল্লা প্রস্তুত করা হয়। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী এ মিষ্টির খ্যাতি রয়েছে।

**উপসংহার :** শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতো সুন্দর বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সৌন্দর্যের কোনো তুলনা নেই। ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক উভয় দিক থেকেই আমাদের দেশ সমৃদ্ধ। আমরা অনেকেই টাকা খরচ করে দেশের বাইরের সৌন্দর্য দেখতে যাই। কিন্তু আমাদের দেশ যে সৌন্দর্যের লীলাভূমি তা হয়তো অনেকেই জানি না। দেশকে ভালোভাবে চিনে-জেনে দেশের সৌন্দর্য উপভোগে আমাদের তৎপর হওয়া উচিত।

## বাংলাদেশের নদনদী

**ভূমিকা :** কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশে অসংখ্য নদীর সমাবেশ দেখে একে ‘জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলা’ বলে অভিহিত করেছেন। ছোট-বড় প্রায় সাত শ নদী এ দেশকে ঘিরে রয়েছে। নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এ দেশের অনেক জনপদ। মাঝের মতো স্নেহ দিয়ে নদীগুলো এ দেশ ঘিরে রেখেছে। তাই এদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলা হয়।

**বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদনদী :** বাংলাদেশের সব নদীর একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা বেশ কঠিন কাজ। তবে এ দেশের প্রধান কিছু নদীর নাম আমাদের সবারই জানা। সেগুলো হলো : পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কৰ্ণফুলী ও মাতামুছুৱী।

**পদ্মা :** বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মা। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে এর উৎপন্নি। ভারতে এ নদীর নাম গঙ্গা। মূলত গঙ্গা নদীর যে ধারাটি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, তার নামই পদ্মা। এ নদী রাজশাহী জেলার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের নিকট যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পদ্মার প্রধান শাখা নদীগুলো হচ্ছে : কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতী ও আড়িয়াল খা। মহানন্দা পদ্মার প্রধান উপনদী।

**মেঘনা :** মেঘনা নদীর জন্ম আসামের পাহাড়ে। সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর মিলিত স্রোত আজমিরিগঞ্জের কাছে এসে ‘কালনী’ নামে পরিচিতি পেয়েছে। শেষে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরববাজারের কাছে এসে এ নদী মেঘনা নাম ধারণ করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস ও চাঁদপুরের ডাকাতিয়া মেঘনার দুটি প্রধান শাখা নদী। গোমতী, মনু, বাউলাই মেঘনার উপনদী।

**যমুনা :** যমুনার উৎস হিমালয় পর্বতে। যমুনা নদী গোয়ালন্দের কাছে এসে পদ্মা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ধলেশ্বরী যমুনার প্রধান শাখা নদী। ধরলা, তিস্তা, করতোয়া ও আত্রাই যমুনার উপনদী।

**কৰ্ণফুলী :** কৰ্ণফুলী নদীর জন্ম আসামের লুসাই পাহাড়ে। রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এ নদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭৪ কিলোমিটার। কৰ্ণফুলী নদী অত্যন্ত খৰস্তোতা। এ নদীর উপর বাঁধ দিয়েই নির্মিত হয়েছে কাণ্ডাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এ নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে কৰ্ণফুলী কাগজ ও রেশম শিল্প-কারখানা। কৰ্ণফুলীর প্রধান উপনদী হচ্ছে হালদা, বোয়ালখালী ও কাসালং।

**ত্রিক্ষপুত্র :** হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবরে এ নদের উৎপত্তি। তিক্রতের পূর্ব দিক ও আসামের পশ্চিম দিক দিয়ে এ নদ প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বংশী ও শীতলক্ষ্যা ত্রিক্ষপুত্রের প্রধান শাখা নদী। ধরলা ও তিস্তা এর উপনদী।

**আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নদ-নদীর প্রভাব :** নদীর সঙ্গে আমাদের জীবন গভীরভাবে জড়িত। আমাদের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে নদীপথ। নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এ দেশের অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র। আমাদের কৃষিক্ষেত্র অনেকাংশেই নদীর ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীরা নদীকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য সাহিত্যকর্ম।

**নদ-নদীর উপকারিতা :** বাংলাদেশকে সবুজে-শ্যামলে ভরে তোলার পেছনে নদ-নদীর ভূমিকা অপরিসীম। নদীর পানিতে বয়ে আসা পলি প্রাকৃতিকভাবে আমাদের মাটিকে উর্বর করেছে। আমাদের কৃষির অঞ্চলগতিতে তাই নদীর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও নদীগুলো মিঠা পানির মাছের অন্যতম উৎস। নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে অসংখ্য মানুষ। দেশীয় প্রয়োজন মিটিয়েও মাছ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা হয়। এ ছাড়া পরিবহন-সংক্রান্ত কাজেও নদীকে ব্যবহার করা হয়। একশ্রেণির মানুষ এ কাজ করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

**নদ-নদীর অপকারিতা :** নদীর কিছু অপকারিতাও আমাদের চোখে পড়ে। বর্ষাকালে নদীগুলো ফুলে-ফেঁপে ওঠে। তখন বন্যা দেখা দেয়। এ ছাড়া নদীর প্রবল স্রোতে ভাঙ্গন শুরু হয়। কখনো কখনো কোনো কোনো গ্রাম ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নদীর মাঝে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। এর ফলে ক্ষতিহস্ত হয় মানুষের ঘরবাড়ি, জমিজমা, গাছগালা, গবাদিপশু ও গৃহসামগ্রী। অনেক সময় নদীর প্রবল স্রোতে মানুষের জীবনহানিও ঘটে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় দশ লক্ষ মানুষ নদীভাঙ্গনের শিকার হয়।

**উপসংহার :** নদ-নদী বাংলাদেশকে করেছে সমৃদ্ধ। এ দেশকে ঘিরে রেখেছে চারদিক থেকে। নদ-নদীগুলো এ দেশের গৌরব। তবে বর্তমানে সে গৌরব ম্লান হতে চলেছে। নদীগুলো ভরাট হয়ে হারিয়ে ফেলেছে তাদের স্বাভাবিক গতিপথ। তাই এ বিষয়ে এখনই আমাদের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

## জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

**ভূমিকা :** ‘থাকব না ক বদ্ধ ঘরে/ দেখব এবার জগঢ়টাকে

কেমন করে ঘুরছে মানুষ/ যুগান্তের ঘূর্ণিপাকে।’

(সংকল্প : কাজী নজরুল ইসলাম)

অনেক খ্যাতিমান কবির কবিতায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। তবে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম। তিনি বিদ্রোহী কবি, মানবতার কবি, প্রেমের কবি। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষ বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান কোনো দিন ভুলবে না।

**কবির জন্মপরিচয় :** ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জায়েদা খাতুন। ছেলেবেলায় নজরুলের নাম ছিল দুঃখ মিয়া।

**কবির শিক্ষাজীবন :** ছোট থেকেই নজরুল ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। গ্রামের মক্কব থেকে তিনি প্রাইমারি পাস করেন। এরপর তিনি ময়মনসিংহের ত্রিশালের দরিয়ামপুর হাইস্কুলে কিছুকাল পড়ালেখা করেন। তারপর তিনি ভর্তি হন বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে। এখানে দশম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্টে সৈনিক হয়ে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেন। নজরুলের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার এখানেই ইতি ঘটে।

**কবির কর্মজীবন :** নজরুল বারো বছর বয়সে লেটোর গানের দলে যোগ দেন। সেখান থেকে তিনি সামান্য কিছু রোজগার করতেন। এরপর তিনি আসানসোলের এক রুটির দোকানে মাসিক এক টাকা বেতনে ঢাকরি নেন। বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর কাব্যসাধনায় তিনি পুরোপুরি নিয়োজিত হন। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় নবযুগ, লাঙল ও ধূমকেতু পত্রিকা। পত্রিকাগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল।

**কবির কাব্যপ্রতিভা :** ১৯২০ সাল থেকে নজরুল পুরোপুরি সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম ‘মুক্তি’। কিন্তু যে কবিতা তাঁকে খ্যাতি এনে দেয় তার নাম ‘বিদ্রোহী’। পরবর্তীকালে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতাটি রচনা করে তিনি ব্রিটিশ শাসকদের ব্যঙ্গ করেছিলেন। এ কারণে তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছে।

**সাহিত্যকীর্তি :** কাজী নজরুল ইসলাম খুব অল্প সময় সাহিত্য সাধনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার মধ্যেই তিনি রচনা করেছিলেন অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, চক্রবাক, দোলনঁপা, ফণীমনসা প্রভৃতি কাব্যগুলি এবং কুহেলিকা, মৃত্যুক্ষুধা প্রভৃতি উপন্যাস। তিনি প্রায় দুই হাজারের মতো গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের সুরের বৈচিত্র্য আমাদের মুক্তি করে। মানুষ এখনো শুন্দি সহকারে তাঁর গান শোনে।

**সংবর্ধনা, সম্মাননা ও পুরস্কার :** ১৯২৯ সালে কলকাতা অ্যালবার্ট হলে নজরুলকে জাতির পক্ষ থেকে সম্মাননা জানানো হয়। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে নজরুলকে সভাপতির পদে সমাচীন করে সম্মান দেখানো হয়। ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলকে ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ প্রদান করে। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৫ সালে তাঁকে ডি.লিট. উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন।

**কবির অসুস্থতা :** ১৯৪২ সালে কবি মন্তিক্ষের পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হলেও সুস্থ হননি তিনি। এর পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন নির্বাক।

**কবির বাংলাদেশে আগমন :** ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচেষ্টায় অসুস্থ কবিকে ঢাকায় আনা হয়। তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং জাতীয় কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়।

**মৃত্যু :** বাংলাদেশে অবস্থানকালে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট কবি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়। প্রতিবছরই তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর সমাধিতে সবাই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

**উপসংহার :** বাঙালির গর্ব নজরুল। বাঙালির প্রিয় কবি নজরুল। তিনি তাঁর সৃষ্টির দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব পেয়েছেন। বাঙালি জাতি চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। তাঁর সাহিত্য যুগ যুগ ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আমাদের প্রেরণা জোগাবে। নজরুল শুধু একটি সময়ের কবি নন। তিনি সব সময়ের সব মানুষের কবি।

## কী ধরনের বই আমার পড়তে ভালো লাগে

**ভূমিকা :** গল্পকার ও ঔপন্যাসিক মাঝিম গোর্কি বলেছেন, ‘আমার মধ্যে উত্তম বলে যদি কিছু থাকে তার জন্য আমি বইয়ের কাছে খণ্ডী।’ সত্যিকার অর্থেই বই মানুষের মধ্যে ইতিবাচক ভাবনার জন্ম দেয়। মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে। তাই তো বই আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

**আমার বই পড়ার শুরুর কথা :** মায়ের কাছ থেকে বর্ণমালা শেখার পর পাঁচ বছর বয়সে আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্কুলের পাঠ্যবই তখন আমার সঙ্গী হয়। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই আমি বই পড়তাম। ছোটবেলায় ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ আমাকে খুব আনন্দ দিত। এ গল্পগুলো আমি নিজে পড়ে যতটা আনন্দ পেতাম, তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পেতাম শুনে। এ ছাড়া ঈশ্বরের গল্প, মোল্লা নাসিরউদ্দীনের গল্প, বীরবলের গল্প ও গোপাল ভাঁড়ের গল্প আমার পড়তে ভালো লাগত। কিন্তু এখন আমি এ রকম বই পড়ি না। গোয়েন্দা গল্প, মুক্তিযুদ্ধের গল্প ছাড়াও আরও নানা রকমের গল্পের বই এখন আমার নিত্যসঙ্গী।

**আমার ভালো লাগার বই :** গোয়েন্দা গল্প পড়তে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। গোয়েন্দা চরিত্রগুলোর মধ্যে ‘ফেলুদা’ আমার সবচেয়ে প্রিয়। অমর এ চরিত্রের স্বষ্টি সত্যজিৎ রায়। ফেলুদাকে নিয়ে সত্যজিৎ রায় অনেকগুলো গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জয় বাবা ফেলুনাথ, কলকাতায় ফেলুদা, বাক্স রহস্য, সোনার কেল্লা, রয়েল বেঙ্গল রহস্য, শেয়াল রহস্য ইত্যাদি। গল্পগুলো যখন আমি পড়ি, তখন আমার মধ্যে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে আমি নিজেকে গল্পের চরিত্র হিসেবেও ভাবতে শুরু করি। ফেলুদার সঙ্গে থাকা তপেসের চরিত্র এ ক্ষেত্রে আমাকে খুবই আকর্ষণ করে। আর জটায়ুর চরিত্র আমাকে আনন্দ দেয়। তবে ফেলুদার চরিত্র এককথায় অসাধারণ। গল্পগুলো যখন আমি পড়ি, তখন সময় কোন দিক দিয়ে কেটে যায় আমার মনেই থাকে না। সব কাজ ভুলে গল্পগুলোর মধ্যে আমি নিজেকে ভুবিয়ে রাখি। যতক্ষণ একটি গল্প পড়া শেষ না হয়, ততক্ষণ আমি বই ছেড়ে উঠতে পারি না। এক কল্পনার জগতের ৯০  
৯১ মধ্যে গল্পগুলো আমাকে টেনে নিয়ে যায়।

**আমার অন্যান্য বইয়ের সংগ্রহ :** গোয়েন্দা গল্প ছাড়াও আমার সংগ্রহে মুক্তিযুদ্ধের বই, ইতিহাসের বই, সাময়িক ফিকশন, গণিতের বই ও ম্যাজিক শেখার বই রয়েছে। গোয়েন্দা গল্প পড়ার পাশাপাশি এ বইগুলো পড়তেও আমার ভালো লাগে।

**বই পড়ে আমার প্রাণি :** আনন্দ পাওয়ার জন্যই আমি মূলত বই পড়ি। তবে গোয়েন্দা গল্পগুলো আমাকে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক হতে সাহায্য করেছে। আমার চারপাশের অজানা জগৎ সম্পর্কে আমাকে ধারণা দিয়েছে বই। বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বই। বই পড়ে আমি মানুষের মন ও তার চিন্তা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা পেয়েছি। ভবিষ্যতে এ জ্ঞান আমাকে পথ চলতে সাহায্য করবে। আমার পরিবার, বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের কাছে আমাকে আদরণীয় করেছে বই।

**উপসংহার :** বই আমাকে সব সময় সৎ পথে চলতে সাহায্য করে। আমার মন খারাপ হলে বস্তুর মতো আমার পাশে থেকে বই আমাকে সাহায্য করে। বই পড়ে আমি মানুষের জন্য ভালো কিছু করার প্রেরণা পাই। জ্ঞান ও বুদ্ধিতে মানুষকে শান্তি হতে হলে বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রত্যেকেরই বই পড়া উচিত।

## আমার চারপাশের প্রকৃতি

**ভূমিকা :** সবুজের চাদরে ঢাকা আমাদের এই দেশ। এ দেশের প্রাকৃতিক শোভা আমাদের মুক্তি করে। এ দেশের প্রকৃতির রূপ বড় বিচিত্র। এ দেশের নদী, মাঠ, অরণ্য, আকাশ, পাহাড় দেখে আমরা পুলকিত হই। আমাদের মাতৃভূমি তার অপরূপ ঐশ্বর্য ও সম্পদে অনন্য।

**চারপাশের প্রকৃতি :** আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা থামের পরিবেশে। এখানকার মাঠ, ঘাট, বন ও প্রান্তর সবকিছুর সঙ্গেই আমার আত্মার সম্পর্ক। তাই এ প্রকৃতি আমার কাছে অন্য সব স্থানের চেয়ে অনেক বেশি আপন।

**বন-বনানী :** আমার চারদিকে সবুজের সমারোহ। যেদিকে তাকাই সেদিকেই ঘন সবুজ। আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল, বট, শাল, সেগুন, মেহগনি, কড়ইসহ আরও কত গাছ। এসব গাছগাছালি মিলে চারপাশে একটা বনের মতো সৃষ্টি হয়েছে। কবি জসীমউদ্দীনের ভাষায় :

বনের পরে বন চলেছে বনের নাহি শেষ,

ফুলের ফলের সুবাস ভরা এ কোন পরীর দেশ

বর্ষার দিনে যখন এ বনে বৃষ্টি আসে, তখন মনে হয় প্রকৃতি যেন তার দুহাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছে। আবার শীতের দিনে যখন গাছগুলোর পাতা বরে পড়ে, তখন প্রকৃতিকে অসহায় মনে হয়। বসন্তে নতুন পাতা এলে গাছগুলো নতুন সাজে সেজে ওঠে। শুধু বড় গাছগুলোই নয়, ছোট গাছগুলোও অপরূপ শোভা সৃষ্টি করে চারপাশে।

**মাঠ-প্রান্ত :** বনের দিক থেকে চোখ ঘোরাতেই ধানখেত সামনে এসে পড়ে। যখন তার উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায়, তখন মনে হয় সবুজের সমুদ্র বুঝি হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পাটক্ষেতের পাটগাছগুলোও বেশ বড় হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মনটা আনন্দে ভরে যাচ্ছে। গমখেতের গমগুলো পেকে উঠেছে। তার উপর যখন সূর্যের আলো পড়ছে, তখন সোনালি আলোয় চারদিক ভরে যাচ্ছে। এ মাঠেই শীতের সময় ফোটে সর্ষেফুল। তখন চারদিক হলুদ হয়ে ওঠে। মৌমাছির দল এসে তখন সেখান থেকে মধু সংগ্রহ করে।

**জলাশয় :** মাঠ পার হয়ে রান্তায় আসতেই একটা বড় পুকুর চোখে পড়ে। পুকুরের চারদিকে নারিকেল ও কলাগাছ লাগানো। পানি কাচের মতো স্বচ্ছ। তার এক কোণে ফুটে আছে শাপলা ফুল। মাঝে মাঝে একটা-দুটো মাছ লাফ দিচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে। দুটো ছেলে অনেক উঁচু একটা গাছের ডাল থেকে পুকুরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে টেউ বয়ে গেল। পুকুরপাড় দিয়ে সামনে আসতেই একটা বিল চোখে পড়ে। বিলে অনেক পানি। জেলেরা সেখানে জাল দিয়ে মাছ ধরছে। বিলের পানিতে হালকা হালকা টেউ। তবে বর্ষায় এমন থাকে না। তখন অনেক বড় বড় টেউ এপার থেকে ওপার অবধি বয়ে যায়। বিলের ওপরে কিছু নৌকা ভেসে চলেছে। কিছু মানুষ বিলের এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে।

**পশ্চপাখি :** গাঞ্জশালিক, বক, বেলে হাঁস, মাছরাঙা ছাড়াও বিলের ধারে রয়েছে আরও অনেক পাখি। রাতে মাঝে মাঝে দু-একটা মেছো বাঘ বিলের ধারে দেখা যায়। এ ছাড়া সবুজ ধানখেতে ও গাছের মাথায় ছুটে আসে টিয়া, চড়ুই, শালিক, ঘুঘু, বুলবুলি, ফিঙে, দোয়েলসহ আরও অনেক পাখি। ঘন সবুজ গাছের আড়ালে মাঝে মাঝে দু-একটা শেয়াল দেখা যায়। তবে সাপ, বেজি, বনবিড়াল সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।

**রাতের আকাশ :** রাতের আকাশ দেখে মনে হয় এ যেন স্বর্গের লীলাভূমি। অগণিত তারা রাতের আকাশকে উজ্জ্বল করে তোলে। পূর্ণিমার সময় চাঁদের আলোয় ঝলমল করে চারপাশ। আবার অমাবস্যার রাতে চারদিকে কালো অঙ্কারে ভরে যায়। তখন জোনাকির আলোয় মানুষ পথ চিনে ঘরে ফেরে।

**সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত :** প্রকৃতি জেগে ওঠে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। কাকড়াকা ভোরে মানুষ ঘুম থেকে উঠে আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সারা দিন পর আকাশ রাঙিয়ে যখন সূর্যাস্ত হয়, তখন প্রকৃতির কোলে যে যার স্থানে ফিরে যায়।

**উগসংহার :** আমার চারপাশের প্রকৃতি চোখ জুড়ানো ও মন ভুলানো। তাই যে একবার এ প্রকৃতির মাঝে আসে, সে আর এখান থেকে যেতে চায় না। খুঁজতে চায় না অন্য কোনো রূপ। কবি জীবনানন্দের ভাষায় :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর

এ দেশের প্রকৃতি ও এর সৌন্দর্য আমার গর্ব। আমি আমার দেশকে খুব ভালোবাসি।

## আমার দেখা একটি মেলা

**সূচনা :** মেলা শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আক্ষরিকভাবে মেলা শব্দের অর্থ হলো ‘মিলন’। মেলায় পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা হয় এবং ভাববিনিময় হয়। একের সঙ্গে অন্যের সংযোগ ঘটে মেলায়। আমাদের সংস্কৃতিতে মেলার গুরুত্ব অসীম।

**মেলার প্রচলন :** অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে মেলার প্রচলন ছিল। তবে তখন মেলার আয়োজন হতো সুনির্দিষ্ট কিছু স্থানে এবং বৃহৎ পরিসরে। বর্তমানে দেশের প্রায় সব স্থানেই মেলা হয়। কোনো কোনোটির আয়োজন অনেক বড়, আবার কোনোটির ক্ষুদ্র। তবে মেলার আনন্দ এখন আগের মতোই রয়েছে।

**মেলার উপলক্ষ :** আমাদের দেশে বেশির ভাগ মেলা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, রথযাত্রা, দোল উৎসব, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের ১০ই মহরমকে কেন্দ্র করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধদের বৌদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া চৈত্রসংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমার দেখা মেলার উপলক্ষ ছিল পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ।

**মেলার স্থান :** সাধারণত খোলা কোনো বৃহৎ স্থানে, যেখানে মানুষের চলাচল রয়েছে, তেমন স্থানেই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সময় স্কুলমাঠেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তবে আমি যে মেলাটি দেখেছি, সেটি বসেছিল নদীর ধারের একটি বৃহৎ বটগাছের নিচে।

**মেলার প্রস্তুতি :** পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাঙালির সবচেয়ে আনন্দের দিন। এদিনকে উপলক্ষ করে মেলার প্রস্তুতি ছিল বিশাল। অস্থায়ীভাবে বটগাছের চারদিকে দোকানপাট তৈরি করা হয়। একদিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যাত্রাপালার জন্য একটি বড় মঞ্চ তৈরি করা হয়। কিছু কিছু মানুষ মূল স্থানে জায়গা না পেয়ে রাস্তার পাশে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে বসার প্রস্তুতি নেয়। অধিকার চারদিকে মাইক লাগানো হয়।

**মেলার চিত্র :** পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মেলা শুরু হয়। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেলার সূচনা করেন। মেলা শুরু হতেই এতে জনস্ন্মোহন দেখা যায়। যে দোকানগুলো কাল পর্যন্ত খালি ছিল তা আজ কানায় কানায় নানা দ্রব্যসামগ্ৰীতে ভরে যায়। মানুষ রঙিন পোশাক পরে মেলায় প্রবেশ করে। ছোট ছেলেমেয়েদের চোখেমুখে আনন্দের ঝলক দেখা যায়। বৃন্দাবন ভিড় এড়িয়ে মেলায় প্রবেশ করতে থাকে। মেলার চারদিকে প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ করা যায়। প্রতিটি দোকানে মানুষ তাদের পছন্দের ও প্রয়োজনের জিনিসপত্র কিনতে শুরু করে। ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড় করে মাটির খেলনা, বেলুন, বাঁশি আরও নানা জিনিসের দোকানে। নারীরা ভিড় করে প্রসাধনসামগ্ৰী ও চুড়ির দোকানে। এ ছাড়া কাপড়ের দোকানেও ভিড় লক্ষ করা যায়। পুরুষেরা তাদের পোশাকের দোকানের সামনে ভিড় করে। মেলার এদিকে মিষ্টির দোকান লক্ষ করা যায়। এখানে গরম জিলিপি কিনতে সবাই ভিড় করে। এ ছাড়া ছোলাভাজা, বাদামভাজা, পাঁপরভাজা, ভুট্টার খই, কনক ধানের খই, মুড়কি, বাতাসা, হাওয়াই মিঠাই ও নানা রকমের মিষ্টি পাওয়া যায় মেলায়। সবাই এগুলো খেতে খেতে মেলায় ঘুরে বেড়ায়। মেলার একদিকে একটি লোক সাপের খেলা দেখাচ্ছিল। তা দেখতে ভিড় করে অসংখ্য মানুষ। এ ছাড়া ছোটখাটো একটা সার্কাসের আয়োজনও ছিল।

**মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান :** সন্ধ্যার সময় মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় শিল্পীদের গান পরিবেশনের পর শুরু হয় যাত্রাপালা। মধ্যে ভেলুয়া সুন্দরীর পালা পরিবেশন করা হয়। যাত্রাপালায় ভেলুয়া সুন্দরীর জীবনের দুঃখ দেখে অনেকেই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্তৃপক্ষ মেলার ইতি টানে।

**মেলার তাৎপর্য :** মেলায় মানুষের সম্প্রতির এক বক্ষন তৈরি হয়। স্থানীয়ভাবে তৈরি জিনিসের একটি প্রদর্শনী হয় মেলায়। মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে মেলায় এসে। শুধু তাই নয়, এখানে অর্থনৈতিক বিষয়ও যুক্ত থাকে। একদল মানুষের উপার্জনের মূল উৎস হলো মেলা। এ ছাড়া ক্রেতারাও তাদের প্রযোজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য মেলার ওপর নির্ভর করে। অনেকে মেলাকে ঘিরে বছরের বিকিনিনির বড় পরিকল্পনাও করে থাকে।

**উপসংহার :** বাঙালি সংস্কৃতির বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে মেলা। মেলা সাধারণ কোনো আয়োজন নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের প্রথা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। মেলার মধ্য দিয়ে একশ্রেণির জীবন ও জীবিকা গড়ে উঠেছে। শুধু গ্রামেই নয়, শহরেও মেলা আনন্দের উৎস। তাই তো মেলার দিনে মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। মানুষকে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে সমবেত করতে মেলার কোনো বিকল্প নেই। তাই তো মেলা আজও আমাদের কাছে এত আকর্ষণীয়।

### একটি দিনের দিনলিপি

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে একটি দিনের সূত্রপাত হয়। আবার সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দিনটি শেষও হয়ে যায়। একটি দিন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি অতীত হয়ে যায়। কিছু স্মৃতি কিছু ঘটনা প্রতিদিনই আমাদের মনে জমা হয়। আর এভাবেই পার হয় আমাদের দৈনন্দিন জীবন।

আজ ২ জানুয়ারি। আমি সপ্তম শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছি। গত ২১ ডিসেম্বর আমার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল দিয়েছে। আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি। বাড়ির সবাই বেশ খুশি হয়েছে। আজ সপ্তম শ্রেণিতে আমার প্রথম ক্লাস হলো। স্কুল একই কিষ্টি ক্লাসক্রম ভিত্তি। স্কুলের সবাইকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। সবার পরনে নতুন স্কুল ড্রেস। কাঁধে নতুন স্কুল ব্যাগ। আর ব্যাগভর্টি নতুন ক্লাসের বই।

স্কুলে আমার প্রথম ক্লাস ছিল বাংলা। জলিল স্যার সবার পরিচয় নিয়ে বাংলা পড়ালেন। ষষ্ঠি শ্রেণিতেও স্যার বাংলা পড়াতেন। স্যারের কষ্ট ও উচ্চারণ আমাকে মুঝে করে। এরপর কাঁকন ম্যাডাম ক্লাস নিলেন। তিনি আমাদের ইংরেজি পড়ালেন। তারপর গণিত ও ধর্ম ক্লাস হলো এবং টিফিনের ঘণ্টা পড়ল। টিফিনে আমি রিংকুর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। রিংকু আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। বার্ষিক পরীক্ষায় আমার থেকে নম্বর কম পেলেও ও আমার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও মেধাবী। ও আমার টিফিন থেকে কিছুটা ভাগও বসাল।

টিফিনের পর আমার বিজ্ঞান ক্লাস শুরু হলো। কালাম স্যার আমাদের অণুর গঠন পড়ালেন। বিজ্ঞানের জটিল জটিল বিষয়গুলো স্যার খুব সহজ করে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। এ কারণে ক্লাসের সবাই তাকে খুব পছন্দ করে। এরপর স্বপন স্যারের সমাজ ক্লাস শেষে আমাদের ছুটি হলো। রিকশায় চড়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

বাড়ি এসে দেখি মা আমার জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছেন। মা আমাকে স্কুলের কথা জিজ্ঞেস করলেন এবং সবার খোঁজ-খবর নিলেন। এরপর আমি ছুটলাম মাঠের দিকে। সবার সঙ্গে ক্রিকেট খেললাম। আসার সময় সাগর ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হলো। সাগর ভাইয়া খুব ভালো। যেকোনো বিপদে তাকে ডাকলেই পাওয়া যায়।

বাড়িতে এসে দেখি বাবা অফিস থেকে ফিরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বাজার থেকে আমার জন্য এনেছেন গরম গরম জিলাপি। মা বাবার পাশে আমাকে বসতে বললেন। আমি বাবার পাশে বসতেই তিনি আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। ভাইবোনদের মধ্যে তিনি আমাকে একটু বেশি ভালোবাসেন। আমাকে সারা দিনের কথা জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

বাবার সঙ্গে কথা শেষ করে আমি বাগানে গেলাম। অনেকগুলো গাঁদা আর ডালিয়া ফুলের চারা লাগিয়েছি বাগানে। সঙ্গে লাগিয়েছি দুটো গোলাপের চারা। একটা ডালিয়া গাছে কলি এসেছে। মনে হয়, লাল রঙের ফুল ফুটবে। গাঁদা গাছগুলোতেও কলি এসেছে। গোলাপগাছের গোড়ায় বেশ আগাছা জমেছে। আমি সব আগাছা পরিষ্কার করে সবগুলো গাছে পানি দিলাম।

সন্ধ্যার সময় হাতমুখ ধুয়ে আমি টেবিলে বসলাম। স্কুলব্যাগ থেকে এক এক করে সবগুলো বই নামলাম। হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলাম নতুন ক্লাসের বই। নতুন বইয়ে একধরনের গন্ধ থাকে। আমি প্রাণভরে সেই গন্ধ নিলাম। তারপর প্রতিটি বইয়ের প্রথম অধ্যায় উল্টে-পাল্টে দেখলাম। ঘণ্টা দুয়েক পর আমি টেবিল থেকে উঠে টেলিভিশন দেখতে গেলাম।

টেলিভিশনে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছিল। খেলায় টান টান উত্তেজনা। অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ভারত এক উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করল। খেলা শেষ হওয়ার পর বাবা সংবাদ শোনার জন্য চ্যানেল পরিবর্তন করলেন। বাবার সঙ্গে আমিও বসে বসে সংবাদ শুনলাম।

রাতে খাওয়ার জন্য সবাই একসঙ্গে টেবিলে বসলাম। খেতে খেতে বাবা অনেক মজার মজার গল্প করলেন। খাওয়া শেষ করে আমি ঘরে চলে এলাম। রাতে মুমানোর আগে আমি প্রতিদিনই বই পড়ি। আজ পড়লাম জুলভান্নের ‘আশি দিনে বিশ্বব্রহ্মণ’। গল্পটা এত আকর্ষণীয় যে পড়া শেষ করতে ইচ্ছেই করছিল না। কিন্তু আমার তো আরেকটা কাজ বাকি। প্রতিদিনের সব কথা লিখে রাখা। এতক্ষণ পর্যন্ত যা লিখেছি, তা ছিল আমার আজকের সারা দিন। কাল আরও একটি নতুন দিন আসবে। ঘটবে আরও নতুন ঘটনা। আরও কিছু অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করবে আমার জন্য। সেগুলোও লেখা হবে আমার দিনপঞ্জির খাতায়।

## শহিদ মিনার

**ভূমিকা :**

**‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙালো একুশে ফেরুয়ারি**

**আমি কী ভুলিতে পারি**

**ছেলে হারা শত মায়ের অশু গড়ায়ে ফেরুয়ারি**

**আমি কী ভুলিতে পারি’**

প্রতিবছর একুশে ফেরুয়ারিতে প্রভাতফেরির এ গান গেয়ে আমরা শহিদ মিনারে যাই। সেখানে ফুল দিয়ে ভাষাশহিদদের প্রতি আমরা শুন্দি জানাই। শহিদ মিনার এদিন ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। আমাদের মনে করিয়ে দেয় মায়ের ভাষা আমাদের কাছে কত আপন। এ ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতেই বাংলার ছেলেরা রাজপথে প্রাণ দিয়েছিল। তাদের স্মৃতি রক্ষার্থেই নির্মিত হয়েছে শহিদ মিনার।

**শহিদ মিনার সূচির পটভূমি :** ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করেন ‘উন্মুক্ত হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।’

এ ঘোষণার প্রতিবাদে ৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস, ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালিত হয়। সেখান থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হবে। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে শাসকগোষ্ঠী ২১ ফেব্রুয়ারিতে সকল প্রকার সভা, মিছিল, মিটিং ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ছাত্রজনতা এ বাধাকে অতিক্রম করে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে মিছিলটি আসতেই পুলিশ তার ওপর গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত, শফিউরসহ আরও অনেকে। তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থেই গড়ে উঠে স্মৃতির শহিদ মিনার।

**প্রথম শহিদ মিনার :** ২১ ফেব্রুয়ারির শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছাত্রজনতা একটি শহিদ মিনার তৈরি করে। এ কাজে অংশ নেয় তিন শ ছাত্র ও দুজন রাজমিস্ত্রি। প্রথম শহিদ মিনার তৈরির জন্য সাইদ হায়দার একটি নকশা প্রণয়ন করেন। তাঁর নকশায় শহিদ মিনারের উচ্চতা নয় ফুট থাকলেও তৈরির পর এটির উচ্চতা হয় এগারো ফুট। শহিদ শফিউরের পিতা ২৪ ফেব্রুয়ারি এটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু কয়েক দিন পরই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ শহিদ মিনারটি ভেঙে ফেলে। তবে বাঙালির হৃদয় থেকে তারা এ মিনারের স্মৃতি মুছে দিতে পারেনি। কবি আলাউদ্দীন আল আজাদের ভাষায় :

**ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙ্গক**

একটি মিনার গড়েছি আমরা চার-কোটি পরিবার।

**আজকের শহিদ মিনার :** বর্তমান শহিদ মিনারটির নকশা করেন স্টপতি হামিদুর রহমান। পরবর্তীকালে শহিদ মিনারটি আরও সংস্কার করা হয়। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আমরা যে শহিদ মিনারটি ফর্মা-১৪, বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি- ৭ম প্রেশি

দেখি সেটিই হামিদুর রহমানের চূড়ান্ত নকশার পরিপূর্ণ রূপ। প্রতিবছর মানুষ এ মিনারের সামনেই ভাষাশহিদদের উদ্দেশ্যে শৃঙ্খলা নিবেদন করে। বর্তমানে এ শহিদ মিনারের আদলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

**শহিদ মিনারের তাৎপর্য :** শহিদ মিনারের স্তম্ভগুলো মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার তথা যা ও তাঁর শহিদ সন্তানের প্রতীক। মাঝখানের সবচেয়ে উচ্চ স্তম্ভটি মায়ের প্রতীক। চারপাশের ছোট চারটি স্তম্ভ সন্তানের প্রতীক, যারা তাদের বুকের রক্ত ঢেলে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আমাদের জীবনে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শুভ তার সঙ্গে শহিদ মিনারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এটি শুধু একটি মিনার নয়, এটি আমাদের প্রেরণার প্রতীক। শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, মুক্তিযুদ্ধেও শহিদ মিনার আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। আমাদের যুদ্ধ জয়ের অন্যতম প্রেরণা একুশে ফেরুজ্যারি। আমরা যখনই অন্যায়ের শিকার হই, তখনি শহিদ মিনার তার প্রতিবাদ করার জন্য আমাদের প্রেরণা জোগায়।

**শহিদ মিনার ও আমাদের সংস্কৃতি :** আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শহিদ মিনারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দেশে যখনই কোনো অন্যায় সংঘটিত হয়, তখনই শহিদ মিনারের সামনে থেকে তার প্রতিবাদ করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান হয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে। এমনকি কোনো জাতীয় বা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর পর তাঁকে শেষ শৃঙ্খলা জ্ঞাপনের জন্য শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে রাখা হয়।

**উপসংহার :** শহিদ মিনার আমাদের প্রেরণার উৎস। আমরা শহিদ মিনারের দিকে তাকিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ অতীতের কথা ভাবি। আর বর্তমান প্রজন্মের কাছে গর্ব করে সে কথাগুলো বলি। আজ একুশে ফেরুজ্যারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেয়েছে। ভাষার জন্য আমাদের আত্মানের ইতিহাস ছাড়িয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী। শহিদ মিনার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বাঙালির সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবীর মানুষ আজ শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষা শহিদদের অবদানকে শৃঙ্খালভরে স্মরণ করে।

## টেলিভিশন

**ভূমিকা :** গ্রিক শব্দ ‘টেলি’ ও লাতিন শব্দ ‘ভিশন’ থেকে টেলিভিশন শব্দটি এসেছে। টেলি শব্দটির অর্থ হলো দূরত্ব আর ভিশন অর্থ দেখা। টেলিভিশন মানুষের খুব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এর মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের যেকোনো ঘটনা মুহূর্তেই আমাদের সামনে চলে আসে। বিনোদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন এখন অঞ্চলগ্র্য। বর্তমান পৃথিবীতে টেলিভিশনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**টেলিভিশনের আবিষ্কার :** ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী জন বেয়ার্ড ১৯২৬ সালে প্রথম টেলিভিশন আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিস্কৃত টেলিভিশনকে আরও সংক্ষার করে ব্রিটিশ ব্রড কাস্টিং ১৯৩৬ সালে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে টেলিভিশনের প্রচার করে। টেলিভিশন নিয়ে এখনো চলছে নানা গবেষণা। পূর্বের মতো টেলিভিশন এখন আর চোখে পড়ে না। পূর্বে যে টেলিভিশন ওজনে ও আয়তনে বৃহৎ ছিল, এখন তা আর তেমন নেই। বিজ্ঞানের

দ্রুত অগ্রগতির ফলে এখন এলসিডি, এলইডি, থ্রিডি ইত্যাদি প্রযুক্তির টেলিভিশন বাজারে দেখা যায়। এগুলো প্রযুক্তিগতভাবে এত উন্নত যে, এতে ছবি দেখে জীবন্ত মনে হয়। তাহাত্তা এগুলো বিদ্যুৎ সাধারণী।

**টেলিভিশনের ব্যবহার :** পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই টেলিভিশন ব্যবহার করা হয়। মূলত বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে টেলিভিশন চালু হয়েছে আজ থেকে প্রায় আটচল্লিশ বছর আগে। বিনোদনের পাশাপাশি আমাদের দেশে টেলিভিশনে গণশিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবার-পরিকল্পনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রচার করে থাকে।

**বাংলাদেশ টেলিভিশন :** ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশন তার যাত্রা শুরু করে। তবে ১৯৮১ সাল থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন রঙিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে। ১৯৮৪ সালে চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় এবং তার পরে টাঙ্গাইলের তালিবাবাদে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। যার ফলে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে প্রেরিত দৃশ্য আমরা টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখতে পাই।

**বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল :** বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কিছু বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চালু আছে। যেমন : এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, এনটিভি, বাংলাভিশন, একুশে টেলিভিশন, বৈশাখী টেলিভিশন, সময় টেলিভিশন, আরটিভি, মোহনা টেলিভিশন, মাছরাঙা টেলিভিশন, চ্যানেল ২৪, দেশটিভি, একাউর (৭১) টিভি ইত্যাদি।

**আমাদের জীবনে টেলিভিশনের উপযোগিতা :** বর্তমানে মানুষের জীবনে টেলিভিশন বিনোদনের প্রধান মাধ্যম। মানুষ তার অবসর কাটায় টেলিভিশনের সামনে বসে। মনের ক্লান্তি দূর করে টেলিভিশন দেখে। একটি টেলিভিশন ঘরে থাকলে সারা দুনিয়ার ঘটনাকে হাতের মধ্যে পাওয়া যায়। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা দেশের সমস্ত খবর আমরা টেলিভিশনের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। জনকল্যাণ ও জনসচেতনতামূলক যেকোনো অনুষ্ঠান টেলিভিশনের মাধ্যমেই প্রচার করা হয়ে থাকে। শিক্ষাবিষয়ক অনুষ্ঠানগুলোও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। টকশোগুলোতে বিভিন্ন মতামত প্রচারিত হয়।

**টেলিভিশনের নেতৃত্বাচকতা :** টেলিভিশন যেমন আমাদের আনন্দ দান করে, তেমনি এর কিছু নেতৃত্বাচক দিকও রয়েছে। অধিক সময় টেলিভিশন দেখলে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে পারে। মাঝে মাঝে টেলিভিশনে ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পরিপন্থি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এ অনুষ্ঠানগুলো তরঙ্গ মনে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলে।

**উপসংহার :** বিজ্ঞান আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। বিজ্ঞানের যুগে সবাই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে। দুনিয়ার সব খবর এখন মানুষের মুঠোর মধ্যে। টেলিভিশন এ কাজকে আরও সহজ করে দিয়েছে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে টেলিভিশন হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। তবে টেলিভিশনে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু নীতিমালা থাকা উচিত, যা আমাদের কিশোর-তরুণদের সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে।

## শৃঙ্খলাবোধ

**সূচনা :** ‘Man is born free, but everywhere he is in chain’—মহান দার্শনিক রংশোর এ বক্তব্যের অর্থ হলো, মানুষ মুক্তভাবে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেও প্রতি পদেই সে শৃঙ্খলিত। এ পৃথিবীর সবকিছুই প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা। প্রকৃতির নিয়মের সামান্যতম ব্যত্যয় ঘটলেই মানবজীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। নিয়ম মেনেই প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। আসে দিন আসে রাত।

**শৃঙ্খলাবোধের শুরুপ :** শৃঙ্খলাবোধ বলতে সাধারণত জীবনযাপনে নিয়মনীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি অনুগত থাকাকে বোায়। সমাজজীবনে কোনো মানুষই আপন খেয়াল অনুযায়ী চলতে পারে না। নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই তাকে লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে। প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থেকে জীবন পরিচালনাই হলো শৃঙ্খলাবোধ।

**শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব :** মানবজীবনের জন্য শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। শৃঙ্খলার কারণেই মানবজীবনে সুখ-শান্তি নেমে আসে। স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি কখনোই সুখী হতে পারে না। সে শুধু নিজেরই নয়, সমাজেরও শান্তি নষ্ট করে। শৃঙ্খলাহীন জীবন লক্ষ্যহীন নৌকার মতো পানিতে ভেসে বেড়ায়। তার কোনো ঠিকানা থাকে না। মানুষ যদি নিজের ভেতর শৃঙ্খলা ধারণ করতে না পারে, তবে সমাজেও নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। তাই সুখী জীবনযাপনের জন্য শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই।

**শৃঙ্খলা চর্চার সময় :** শৈশব হলো শৃঙ্খলা চর্চার উপযুক্ত সময়। নিয়ম মানেই শৃঙ্খলা। এটি রঞ্জ করে চর্চার মাধ্যমে জীবনকে সুখী করা যায়। মানবজীবনে সফলতার চাবিকাঠি হলো শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার ফলেই মানুষ সমাজের আচরণবিধি মেনে চলে এবং সফলভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

**ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা :** ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা বিশেষ গুরুত্ব পালন করে। কারণ এ সময়েই ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ রোপিত হয়। শৃঙ্খলাবোধ একজন ছাত্রকে দায়িত্বশীল করে তোলে। পড়াশোনার প্রতি তার মনোযোগ বৃদ্ধি করে। ভবিষ্যতে শৃঙ্খলাবোধই তাকে সুনাগরিক হতে সাহায্য করে।

**মানবজীবনে শৃঙ্খলা :** সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ উন্নত, কারণ সে নিয়মবদ্ধ জীবনযাপন করে। জীবনকে সার্থক করতে শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই। শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষ শুধু নিজের বা পরিবারের জন্য নয়, রাষ্ট্রের জন্যও সম্পদ। মানবজীবনে লক্ষ্যকে জয় করতে শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই।

**সমাজজীবনে শৃঙ্খলা :** আদিম যুগ থেকেই মানুষের সমাজে কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা হয়। বর্তমান যুগেও নিয়ম-শৃঙ্খলা সমাজের জন্য অপরিহার্য। সত্যিকার অর্থে নিয়ম-শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো সমাজ চলতে পারে না। নিয়মবদ্ধভাবেই সমাজের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। শৃঙ্খলাই সমাজকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলে। অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা সমাজকে ধৰ্মসের পথে নিয়ে যায়। সমাজকে সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই।

**শৃঙ্খলা সৃষ্টির উপায় :** পরিবার শৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র। একটি শিশু পরিবার থেকেই প্রথম শৃঙ্খলা শেখে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় বিদ্যালয়ে। শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুর শৃঙ্খলাবোধকে

জাগিয়ে তোলে। উভরোত্তর এ শৃঙ্খলাবোধের মধ্য দিয়েই শিশু একদিন উন্নত চরিত্রের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।

**শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা :** মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শৃঙ্খলা মেনে না চললে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তার জীবনে নেমে আসে পরাজয়ের ঘানি। খুব সমৃদ্ধ কোনো সমাজ বা প্রতিষ্ঠানও শৃঙ্খলার অভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অতএব শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা অনন্বীক্ষ্য।

**বিশৃঙ্খলার পরিণতি :** বিশৃঙ্খলার পরিণতি ভয়াবহ। বিশৃঙ্খলতা শুধু ধ্বংসই ডেকে আনে। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিক যতই দক্ষ হোক না কেন, তাকে শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হয়। একমুহূর্তের বিশৃঙ্খলা তাকে এবং তার সহযোগীদের মারাত্মক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। খেলার মাঠে কোনো খেলোয়াড় যদি বিশৃঙ্খল আচরণ করে, তবে তার দল নিশ্চিত অর্থে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। বিশৃঙ্খলা এভাবেই মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

**উপসংহার :** একজন মানুষ, একটি সমাজ, একটি জাতি তখনই সভ্য হয়ে ওঠে, যখন তার মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একটি সভ্যতা তথা জাতি তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তার মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের অভাব দেখা গিয়েছে। শৃঙ্খলাহীন মানুষের যেমন কোনো ঝর্ণাদা নেই, তেমনি শৃঙ্খলাহীন জাতিরও কোনো সম্মান নেই। এ কারণেই সমাজজীবনে শৃঙ্খলা এত অত্যাবশ্যকীয়।

## সুন্দরবন

**ভূমিকা :** সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এ বনের ৬২ শতাংশ বাংলাদেশের খুলনা জেলায় এবং বাকি ৩৮ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের চবিশপুরগন্ডা জেলায় অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুন্দরবন অতুলনীয় এবং জীববৈচিত্র্যে অসাধারণ। সুন্দরবন একটি একক ইকো সিস্টেম। এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছেও একটি আকর্ষণীয় স্থান।

**সুন্দরবনের আয়তন ও অবস্থান :** আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর পূর্বে সুন্দরবন ১৬,৭০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর আয়তন সংকুচিত হয়ে গেছে। বর্তমানে এ বনভূমির আয়তন ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার। সমস্ত সুন্দরবন দুটি বন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

**সুন্দরবনের ভূতত্ত্ব, মৃত্তিকা ও জলবায়ু :** সুন্দরবনের ভূভাগ হিমালয় পর্বতের ভূমিক্ষয়জনিত জমা পলি থেকে সৃষ্টি। ভূ-বিজ্ঞানীরা এখানকার ভূমির গঠনবিন্যাসে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সামান্য ঢালের সঞ্চালন পেয়েছেন। কৃপ খনন গবেষণা থেকে দেখা যায়, সুন্দরবনের পশ্চিম এলাকা তুলনামূলক ছ্রিয়। তবে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একটি অংশ ত্রুটেই নিয়মুন্মুখী হচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরের তুলনায় সুন্দরবনের মাত্র একটু আলাদা

ধরনের। জোয়ার-ভাটার কারণে এখানকার পানিতে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা বেশি। এখানকার মাটি পলিযুক্ত দো-আশ।

**সুন্দরবনের উষ্ণিদি :** সুন্দরবনের উষ্ণিদিকুল বৈচিত্র্যময়। এখানকার অধিকাংশ গাছপালা ম্যানগ্রোভ ধরনের। এখানে রয়েছে বৃক্ষ, লতাগুল্ম, ঘাস, পরগাছা ইত্যাদি উষ্ণিদি। উষ্ণিদিবিজ্ঞানী ডি.প্রেইন সুন্দরবনে ৩৩৪ প্রজাতির উষ্ণিদি আছে বলে উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সন্ধানপ্রাপ্ত ৫০টি ম্যানগ্রোভ উষ্ণিদির মধ্যে সুন্দরবনেই আছে ৩৫টি। সুন্দরবনের উষ্ণিদির মধ্যে রয়েছে সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, ধুন্দল, বাইন প্রভৃতি। এ ছাড়া সুন্দরবনের প্রায় সবখানেই জন্মে গোলপাতা।

**সুন্দরবনের প্রাণী :** বিচির সব প্রাণীর বাস সুন্দরবনে। এখানে রয়েছে বহু প্রজাতির স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, ও উভচর প্রাণী। রয়েছে শতশত প্রজাতির পাখি ও মাছ। সুন্দরবনের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত। এ ছাড়া রয়েছে চিত্রা ও মায়া হরিণ, বানর, বনবিড়াল, লিওপার্ড, শজারক, উদ এবং বন্য শূকর। এখানে রয়েছে বিচির সব পাখি। বক, সারস, হাড়গিলা, কাদাখোঁচা, লেনজা ও হট্টিটি এখানকার নদী-নালা ও গাছপালার মাঝে বসবাস করে। সমুদ্র উপকূলে দেখা যায় গাঙ্গচিল, জল কবুতর, টার্ন ইত্যাদি। এ ছাড়া চিল, সঁগল, শকুন, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, ভগীরথ, পেঁচা, মধুপায়ী, বুলবুলি, শালিক, ফিঙে, ঘুঘু, বেনে বৌ, হাঁড়িঁচাচা, ফুলঝরি, মুনিয়া, টুন্টুনি, দোয়েল, বাবুই প্রভৃতি পাখি সুন্দরবনে বাস করে। সুন্দরবনের সরীসৃপদের মধ্যে রয়েছে কুমির, সাপ, টিকটিকি-জাতীয় সরীসৃপ ইত্যাদি।

**অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুন্দরবনের অবস্থান :** সুন্দরবনে প্রাণ কাঠ জ্বালানি ও কাঠকয়লা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া ম্যানগ্রোভের ফল গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গোলপাতা শুকিয়ে ঘরের চাল ও বেড়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনে যে শামুক-বিনুক পাওয়া যায়, তা খাবার চুনের ভালো উৎস। সুন্দরবনের মধুর ওপর নির্ভর করে একশেণির মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। দেশে বিক্রির পাশাপাশি এ মধু বিদেশেও রপ্তানি হয়। মৎস্যজীবীরা সুন্দরবন থেকে মাছ ধরে তা স্থানীয় বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করে। সুন্দরবনের বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে কয়েকটি শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে খুলনা নিউজপ্রিন্ট ও হার্ডবোর্ড মিলস উল্লেখযোগ্য।

**বর্তমানে সুন্দরবনের অবস্থা :** সুন্দরবনের বনজ সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মানুষ অহরহ প্রবেশ করছে এখানে। ফলে এর ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এ ছাড়া লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে ম্যানগ্রোভও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের শেষ আবাসস্থল সুন্দরবন। চোরা শিকারিদের হামলায় বাঘের সংখ্যা দিনেদিনে কমে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক আইলায় সুন্দরবন ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

**উপসংহার :** সুন্দরবন আমাদের ঐতিহ্য। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে উন্নত করতে সুন্দর বনের ভূমিকা অনন্বীক্ষ্য। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন। তাই আমাদের উচিত সুন্দরবন ও এর প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে উদ্যোগী হওয়া।

## অনুধাবন দক্ষতা :

লিখিত কোনো বিষয় সাধারণভাবে আমরা অনেকেই পড়ে থাকি। কিন্তু সেই অংশটুকু পড়ে তার মূলভাব বুঝতে পারাকে বলে অনুধাবন দক্ষতা। একটি পাঠে কিছু শব্দ থাকে, কিছু নতুন বিষয় থাকতে পারে, যার অর্থ বা ধারণা জানা না থাকলে পাঠটির পূর্ণ ধারণা লাভ সহজ হয় না। তাই একটি পাঠ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে পাঠসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ও জানতে, বুঝতে হয়। আবার তা কেবল মুখস্থ করলে সেটি বেশি দিন মনে না-ও থাকতে পারে। সেই জানা জ্ঞান অন্য কোনো পাঠের সাথে বা জ্ঞানের সাথে মেলাতে পারার ক্ষমতাও থাকতে হয়। এভাবেই অনুধাবন দক্ষতা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়। অনুধাবন দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য একটি অনুচ্ছেদ দেওয়া হয়। অনুচ্ছেদটি পড়ে ত্রিপ্লের উভর দিতে হয়। এর জন্য নম্বর বরাদ্দ থাকে  $1 \times 5 = 5$ ।

### অনুধাবন পরীক্ষা :

পৃষ্ঠবী, নির্বার, অর্ক, মৃত্তিকা, আবণী, সৃষ্টি ও অত্রি শীতের ছুটিতে চরকাবায় বেড়াতে গিয়েছে। ওরা ভাই-বোন মিলে এলাকাটির সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখল। ওখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি বাজার আছে। এলাকার অধিকাংশ জনগণই শিক্ষিত। কৃষ্ণজীবী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ীসহ নানা পেশার মানুষ সেখানে বসবাস করেন। বেশ কিছু লোক জীবিকার তাগিদে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপসহ নানা দেশে চাকরি নিয়ে গেছেন। এলাকার জনগণ মোটামুটি সচ্ছল। বৈদেশিক অর্থ লেনদেনের জন্য ওখানে বেশ কিছু ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনো কোনো বাড়িতে ফুলের বাগানও রয়েছে। চরকাবা এলাকাটি বাংলাদেশের একটি আদর্শ গ্রামীণ এলাকা।

**উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উভর দাও।**

- ক. জীবিকা শব্দের অর্থ কী?
- খ. কৃষ্ণজীবি কারা?
- গ. সচ্ছল পরিবার বলতে কী বুঝায়?
- ঘ. চরকাবায় কেন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?
- ঙ. আদর্শ গ্রাম বলতে কেমন গ্রামকে বুঝায়?

## সারাংশ/সারমর্ম

কোনো পদ্য বা গদ্যের মূলভাব বা বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার নামই সারমর্ম বা সারাংশ। সাধারণত পদ্যের ভাব সংক্ষেপে প্রকাশকে সারমর্ম এবং গদ্যের বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে সারাংশ বলে। সারমর্ম বা সারাংশ লেখার সময় :

১. যে পাঠটুকুর সারমর্ম বা সারাংশ রচনা করতে হবে, সেটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।
২. বাড়তি বিষয় বর্জন করতে হবে। কখনো কোনো পাঠের মূল ভাব উপমা রূপকের আড়ালে থাকতে পারে, তা বুঝে মূল ভাব লিখতে হবে।
৩. সারাংশ বা সারমর্মে উপমা, রূপক — এসব বাদ দিয়ে লিখতে হবে।
৪. প্রত্যক্ষ উক্তি বর্জন করে পরোক্ষ উক্তিতে লিখতে হবে।
৫. আমি, আমরা বা ভূমি, তোমরা দিয়ে বাক্য শুরু করা যাবে না।
৬. মূল অংশে উদ্ধৃতি থাকলে প্রয়োজনে সেই উদ্ধৃতির ভাবটুকু উদ্ধৃতি ছাড়া লিখতে হবে।

এক.

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল  
 গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।  
 মুহূর্ত নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,  
 রচে যুগ-যুগান্তর— অনন্ত মহান,  
 প্রত্যেক সামান্য ঝটি ক্ষুদ্র অপরাধ,  
 ঝর্মে টালে পাপ পথে ঘটায় প্রমাদ।  
 প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,  
 —এ ধরায় স্বর্গ সুখ নিত্য দেয় আনি।

**সারমর্ম :** পৃথিবীর কোনো কিছুই সামান্য নয়। ছোট ছোট বালুকণা যেমন মহাদেশ তৈরি করে, তেমনি বিন্দু বিন্দু জল মহাসাগরের জন্ম দেয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্তের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় যুগ-যুগান্তরের। সামান্য অপরাধের পথ ধরেই আসে মহাপাপ। সামান্য একটু করুণার ও স্নেহের বাণী এ পৃথিবীতে স্বর্গসুখ এনে দিতে পারে। তাই ছোট হলেই কোনো কিছু তুচ্ছ নয়।

দুই.

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদুর?

মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক— মানুষেতে সুরাসুর—

রিপুর তাড়নে যখন মোদের বিবেক পায়গো লয়,

আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পৃড়িতে হয়।

ধীতি ও শ্রেমের পুণ্য বাধনে যবে মিলি পরম্পরে

স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েছরে।

**সারমর্ম :** স্বর্গ বা নরক দূরে কোথাও নয়। স্বর্গ ও নরক মানুষের মাঝেই বিরাজ করে। মানুষ যখন কোনো খারাপ কাজ করে অনুতপ্ত হয়ে যন্ত্রণায় ভোগে, তখন সেটাই নরকযন্ত্রণা। পরম্পরের প্রতি বিভেদ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বে মানুষ এই পৃথিবী নরকে পরিণত করে। যখন একে অন্যকে সব বৈরিতা ভুলে বিশুদ্ধভাবে ভালোবাসে, তখনই পৃথিবীতে নেমে আসে স্বর্গীয় সুখ।

তিনি.

আসিতেছে শুভদিন,

দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে খণ!

হাতুড়ি শাবল গাইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,

পাহাড়-কাটা সেই পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,

তোমারে সেবিতে হইলো যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,

তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,

তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান,

তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উথান।

**সারমর্ম :** পৃথিবীর যত উন্নতি সবই শ্রমজীবী মানুষের দান। তাদের নিরলস সেবা ও শ্রমের কারণেই আমরা সুখী জীবন যাপন করি। তাদের এই শ্রমের মূল্য আমরা দেই না, তাদের দুঃখ-বেদনা অনুভব করতে চাই না। প্রকৃতপক্ষে তারাই সভ্যতার অগ্রযাত্রার কারিগর। তাই পরিশ্রমী মানুষ শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের জয়গান করা আমাদের কর্তব্য।

চার.

বিপদে মোরে রক্ষা করো  
এ নহে মোর প্রার্থনা -  
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিঠে  
নাই-বা দিলে সাজ্জনা,  
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।  
  
সহায় মোর না যদি জুটে  
নিজের বল না যেন টুটে,  
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি  
জড়িলে শুধু বঞ্চনা,  
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।।

**সারমর্ম :** কবি সৃষ্টিকর্তার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন না। কবি কামনা করেন, তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যেন তিনি যথাযথভাবে পালন করতে পারেন। বিপদ হতে রক্ষা, দুঃখে সাজ্জনা, কর্মের ভার লাঘব তাঁর প্রত্যাশিত নয়। কবির কামনা বিপদকে, দুঃখকে, ভয়কে জয় করার মনোবল যেন তাঁর অটুট থাকে।

পাঁচ.

সময় ও শ্রোত কাহারও অপেক্ষায় বসে থাকে না, চিরকাল চলিতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় করো, ইহাকে ভয় দেখাও ভ্রক্ষেপও করিবে না, সময় চলিয়া যাইবে, আর ফিরিবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সময় একবার গত হইয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্পত্তি। যতই কাঁদ না গত সময় আর ফিরিয়া আসিবে না।

**সারাংশ :** সময় চিরবহুমান। শত চেষ্টা করলেও সময়ের গতিকে কেউ বৃদ্ধি করতে পারে না। চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে হয়তো লুণ-স্বাস্থ্য বা ধৰ্মস হওয়া ধন-সম্পদ পুনরায় উদ্ধার করা যায়। কিন্তু চলে যাওয়া সময়কে শত চেষ্টায়ও কখনোই ফিরিয়ে আনা যায় না।

ছয়.

অপরের জন্য তুমি প্রাণ দাও, আমি তা বলতে চাইনে। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর করো। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বলো। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটু করণ চাহনি নিষ্কেপ করো, তাহলেই অনেক হবে। চরিত্রবান, মানবতাসম্পন্ন মানুষ নিজের চেয়ে পরের অভাবে বেশি অধীর হন, পরের দুঃখকে ঢেকে রাখতে গৌরববোধ করেন।

**সারাংশ :** মানুষের জন্য অনেক বড় কিছু করতে না পারলেও ছোট ছোট কাজের দ্বারাও আমরা মানুষের উপকারে আসতে পারি। সাধ্যমতো সহায়তা দিয়ে অন্যের মনে আশার সঞ্চার করতে পারি। মানবিক আচরণ দিয়ে অসহায় মানুষকে সাজ্জনা দিতে পারি। এভাবেই মহৎ মানুষ তাঁদের মহস্তের পরিচয় দেন।

সাত.

অভাব আছে বলিয়াই জগৎ বৈচিত্র্যময়। অভাব না থাকিলে জীব সৃষ্টি বৃথা হইতো। অভাব আছে বলিয়াই অভাব পূরণের জন্য এতো উদ্যম, এতো উদ্যোগ। আমাদের সৎসার অভাবক্ষেত্র বলিয়াই কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলকেই স্থাগু, স্থবির হইতে হইতো, মনুষ্যজীবন বিড়বনাময় হইতো। মহাজ্ঞানীরা জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই তো আমরা সেবার সুযোগ পাইয়াছি। সেবা মানবজীবনের ধর্ম। দুঃখ আছে বলিয়াই সে সেবার পাত্র যত্নত্র সদাকাল ছড়াইয়া রাখিয়াছে। যিনি অনন্দান, বন্ধুদান, জ্ঞানদান, বিদ্যাদান করেন তিনি যেমন জগতের বন্ধু, তেমনি যিনি দুঃখে আমাদের সেবার পাত্রে অজস্র দান করিতেছেন, তিনিও মানবের পরম বন্ধু। দুঃখকে শক্ত মনে করিও না, দুঃখ আমাদের বন্ধু।

**সারাংশ :** অভাব বা প্রয়োজনের কারণেই মানুষ সৃষ্টি করে। সৃষ্টির প্রেরণাই মানুষের কাজের উৎস। অভাব না থাকলে মানুষ অলস হয়ে যেত। দুঃখ আছে বলেই মহামানবগণ সেবার হাত প্রসারিত করেন। দুঃখে যিনি এগিয়ে আসেন, তিনি মানবের পরম বন্ধু। দুঃখের আগনে পুড়েই মানুষ খাঁটি সোনা হয়। তাই দুঃখকে শক্ত ভাবা ঠিক নয়।

### ভাবসম্প্রসারণ

আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় কখনো কোনো একটি বাকে বা কবিতার এক বা একাধিক চরণে গভীর কোনো ভাব নিহিত থাকে। সেই ভাবকে বিস্তারিতভাবে লেখা, বিশ্লেষণ করাকে ভাবসম্প্রসারণ বলে। যে ভাবটি কবিতার চরণে বা বাকে প্রচলনভাবে থাকে, তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। সাধারণত সমাজ বা মানবজীবনের মহৎ কোনো আদর্শ বা বৈশিষ্ট্য, নীতি-নৈতিকতা, প্রেরণামূলক কোনো বিষয় যে পাঠে বা বাকে বা চরণে থাকে, তার ভাবসম্প্রসারণ করা হয়। ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে রূপকের আড়ালে বা প্রতীকের ভেতর দিয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়, তাকে যুক্তি, উপমা, উদাহরণ ইত্যাদির সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে হয়।

**ভাবসম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে যেসব দিক বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে :**

এক. উদ্ভৃত অংশটুকু মনোযোগসহ পড়তে হবে।

দুই. অন্তর্নিহিত ভাবটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

তিন. অন্তর্নিহিত ভাবটি কোনো উপমা-রূপকের আশ্রয়ে নিহিত আছে কি না, তা চিন্তা করতে হবে।

চার. সহজ-সরলভাবে মূল ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

পাঁচ. মূল বক্তব্যকে প্রকাশরূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে।

ছয়. বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এক.

পিতামাতা গুৱজনে দেবতুল্য জানি,  
যতনে মানিয়া চল তাহাদেৱ বাণী।

**মূলভাৱ :** বাবা, মা ও অভিভাৱকবৃন্দ আমাদেৱ জীৱন গঠন ও পরিচালনাৰ জন্য যেসব উপদেশ দেন,  
সেগুলো মেনে চলা কৰ্তব্য।

**সম্প্ৰসাৱিত ভাৱ :**

পিতা-মাতা আমাদেৱ জীৱন দান কৱেন এবং অনেক কষ্ট কৱে লালন-পালন কৱেন। পিতা-মাতাৰ সঙ্গে অন্য গুৱজনৱাও আমাদেৱ সুস্থ জীৱন বিকাশে সহায়তা কৱেন এবং অনেক কষ্ট স্বীকাৱ কৱে আমাদেৱ বড় কৱে  
তোলেন। এঁৰা সবাই বয়সে, জানে, বুদ্ধিতে, প্ৰজ্ঞায় আমাদেৱ থেকে অনেক বড়। তাঁৰা আমাদেৱ স্নেহ কৱেন,  
ভালোবাসেন এবং সৰ্বদাই মঙ্গল কামনা কৱেন। অভিভূতার আলোকে তাঁৰা জানেন কী কৱলে আমাদেৱ ভাল  
হবে। নবীনতা ও অনভিভূতার কাৱণে এই কঠিন ও জটিল পৃথিবীৰ অনেক কিছুই আমাদেৱ অজানা। সে  
জন্য পিতা-মাতা, গুৱজন ও বিশ্বেৰ মহান ব্যক্তিদেৱ উপদেশ চলাৰ পথে আলোকবৰ্তিকা হিসেবে গ্ৰহণ কৱতে  
হবে। আৱ তা না কৱতে পারলে জীৱনে সফলতা আসবে না। প্ৰতি মুহূৰ্তে আমৱা হোচ্চট খাৰ। আমৱা জানি,  
ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ, বায়েজিদ বোস্তামি কীভাৱে গুৱজনদেৱ আদেশ-উপদেশ পালন কৱেছেন। আৱ সে  
কাৱণেই তাঁৰা আজ সকলেৰ শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰে পৱিণত হতে পেৱেছেন। তাই পিতা-মাতা, গুৱজন আদৰ্শস্থানীয়,  
দেবতুল্য এবং আৱাধনাযোগ্য। তাঁদেৱ বাণী অনুসৰণ কৱে নিজেৰ জীৱন গড়তে হবে এবং দেশ, জাতি তথা  
সমগ্ৰ বিশ্বকে শাৰ্ষত কল্যাণেৰ দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

**সিদ্ধান্ত :** পিতা-মাতা, গুৱজন ও বিশ্বেৰ মহান ব্যক্তিদেৱ উপদেশ মানলে নিজেৰ জীৱন সুন্দৱ ও বিকশিত  
হবে এবং দেশ ও জাতি উন্নতিৰ শিখৰে পৌছাতে পারবে।

দুই.

আমাদেৱ দেশে হবে সেই ছেলে কৰবে  
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

**মূলভাৱ :** কাজই মানুষেৰ পৱিচয়কে ধাৰণ কৱে। মুখে বড় বড় কথা না বলে কাজ কৱলে সভ্যতাৰ বিকাশ  
সাধন হবে।

**সম্প্ৰসাৱিত ভাৱ :** আমাদেৱ সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যাৱা অনেক কথা বলতে ভালোবাসে কিন্তু  
কাজেৰ সময় তাৱা ফাঁকি দেয়। উপরন্তু কাজ শেষে তাৱা অন্যেৰ সমালোচনা কৱে। এসব মানুষ সমাজেৰ  
জন্য ক্ষতিকৰ। তাৱা সভ্যতাৰ বিকাশে কোনো ভূমিকা রাখে না বৱং এৱ অগ্ৰাধাৰায় প্ৰতিবন্ধকতা সৃষ্টি কৱে।  
কিন্তু নিজে কাজ কৱলে এবং অন্যেৰ কাজে সহায়তা কৱলে আমাদেৱ দেশেৰ উন্নতি তুৱাৰিত হবে। বিশ্বেৰ  
সব দেশেই শ্ৰমকে, কৰ্মকে বিশেষ মৰ্যাদা দেওয়া হয়। মহামানবদেৱ জীৱনী পাঠ কৱলে দেখা যায়, তাঁৰা কৰ্ম

ও নিষ্ঠা দিয়ে পৃথিবীতে নিজেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করে রেখেছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁরা সারা বিশ্বে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এখন থেকে চার দশকেরও অধিক সময় আগে নিল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিঙ্গ ও এডউইন অলড্রিন—এই তিনজন মানুষ ঐকান্তিক সাধনা, নিরলস শ্রম ও কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে চাঁদে অবতরণ করতে পেরেছিলেন। এই দৃঃসাহসী কাজের জন্য তাঁরা আজও মানুষের কাছে বরণীয় হয়ে আছেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরা বিজ্ঞানকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদেরও উচিত তাঁদের পথকে অনুসরণ করে ভালো ও পুণ্যকর্ম করে নিজের, পরিবারের তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করা। আর যারা কাজ না করে বেশি কথা বলে, তাদের মানুষ বাচাল বলে। আর বাচালের সঙ্গ ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

**সিদ্ধান্ত :** আত্মসম্মতি পরিত্যাগ করে কাজ ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে।

তিন.

### নানান দেশের নানান ভাষা বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

**মূলভাব :** মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত রসান্বাদন করতে পারে এবং এই ভাষায়ই তাদের প্রাণের স্ফূর্তি ঘটে।

**সম্প্রসারিত ভাব:** পৃথিবীর প্রায় সব জাতিরই নিজস্ব ভাষা আছে এবং এক ভাষা থেকে অন্য ভাষা আলাদা। আমরা ভাষার মাধ্যমে শুধু নিজের মনের ভাবই অন্যের কাছে প্রকাশ করি না, মাতৃভাষার সাহায্যে অন্যের মনের কথা, সাহিত্য-শিল্পের বক্তব্যও নিজের মধ্যে অনুভব করি। নিজের ভাষায় কিছু বোঝা যত সহজ, অন্য ভাষায় তা সম্ভব নয়। বিদেশে গেলে নিজের ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায় আরও প্রখরভাবে। তখন নিজের ভাষাভাষী মানুষের জন্য ভেতরে ভেতরে মরহুমির মতো ত্রুষ্ট হয়ে থাকে মানুষ। আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের ভাষা। বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি, পড়ালেখা করি, গান গাই, ছবি আঁকি, সাহিত্য রচনা করি, হাসি-খেলি, আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করি। অন্য ভাষায় তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এই ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনের শুরুতে অন্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করে পরে আক্ষেপ করেছেন এবং মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন। মায়ের মুখের বুলি থেকে শিশু তার নিজের ভাষা আয়ত্ত করা শুরু করে এবং এই ভাষাতেই তার স্বপ্নগুলো রূপ দেবার চেষ্টা করে, এই ভাষাতেই লেখাপড়া করে এবং জগৎ ও জীবনকে চিনতে শুরু করে। ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে আন্তসম্পর্কের জন্য, দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত রাখার জন্য আমাদের অন্য ভাষা বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা শিখতে হয়। কিন্তু মাতৃভাষার বুনিয়াদ শক্ত না হলে অন্য ভাষা শেখাও আমাদের জন্য কঠিন হয়ে ওঠে।

**সিদ্ধান্ত :** স্বদেশের ভাষাকে ভালোবাসতে হবে, এর বিকাশ ও সমৃদ্ধিকে অবাধ করতে হবে এবং বিকৃতিকে ব্যোধ করতে হবে। সুপেয় জল যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি স্বদেশের ভাষা সুমিষ্ট।

চার.

### লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড

**মূলভাব :** লাইব্রেরি হচ্ছে জ্ঞানের আধার। একটি জাতির রংচির পরিশুল্ক, জ্ঞানের গভীরতা ও সভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় ঐ জাতির লাইব্রেরির মাধ্যমে।

**সম্প্রসারিত ভাব :** একটি জাতি বা দেশের সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, খেলাধুলা-বিনোদন, সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয়কে ধারণ করে সেই জাতির স্বত্ত্বে তৈরি লাইব্রেরি। কখনো কখনো মানুষের মুখ যেমন ব্যক্তির অঙ্গর্গত রূপ বা পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে, তেমনি লাইব্রেরি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতিকে চিহ্নিত করে। লাইব্রেরি জাতির অতীত ও বর্তমানকে এক সুভাষ বেঁধে রাখে এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা দেয়। জ্ঞানাব্ধৈর ও সত্যসন্ধানী মানুষ লাইব্রেরিতে এসে নিজেকে সমৃদ্ধ করে এবং জাতির সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে ভূমিকা রাখে। একটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত সাহিত্যগুলি দেখে সংশ্লিষ্ট জাতির সাহিত্যকল্প উপলব্ধি করা যায়, বিজ্ঞানগুলি দেখে জাতির বিজ্ঞান-চিন্তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুভব করা যায়। তাই গ্রাহাগার হচ্ছে কালের সাক্ষী। জ্ঞান-বিজ্ঞানসংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে লাইব্রেরি পরম বন্ধু এবং অনন্ত উৎস। পৃথিবীতে যত বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলোর প্রতিটির পেছনে রয়েছে লাইব্রেরির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই অনেক বড় বড় যুদ্ধের পরে দেখা গেছে বিজয়ী শক্তি পরাজিত জাতির লাইব্রেরিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। একটি বৃহৎ লাইব্রেরি জাতির সব ধরনের তথ্যই শুধু সংরক্ষণ করে না, দেশের সঠিক উন্নতিতেও প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। লাইব্রেরি মানুষের আনন্দের খোরাক জোগায় এবং মানুষের মনকে প্রশান্ত করে। পুস্তকপাঠ মানুষের একটি সৃষ্টিশীল শখ। আর এই শখ পূরণের জন্য লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্তাবী।

**সিদ্ধান্ত :** যে জাতি যত উন্নত, সেই দেশের লাইব্রেরি তত সমৃদ্ধ।

পাঁচ.

### পুঁজি আগন্তর জন্য ফোটে না

**মূলভাব :** অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই মানুষ্যজীবনের সার্থকতা।

**সম্প্রসারিত ভাব :** ফুল এই জগতের একটি অনিন্দ্যসুন্দর সৃষ্টি। তার সৌন্দর্য দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়। ফুলের গন্ধে মানুষের মন ভরে ওঠে। ফুল থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে, ফুল থেকে তৈরি হয় ফল। সেই ফল মানুষ, পশু-পাখি খেয়ে স্কুধা নিবৃত্ত করে এবং দেহ ও মনের বিকাশের জন্য খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে। ফুল-ফল থেকে তৈরি হয় জীবন রক্ষাকারী অনেক ওষুধ। ফুলের প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের সৌরভ। ফুল প্রিয়জনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপহার। যেকোনো আনন্দ-উৎসবকে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয় করতে ফুলের কোনো বিকল্প নেই। অন্যের মধ্যে আনন্দ-সঞ্চার ও উপকারের মধ্যেই ফুলের পরিতৃষ্ণি। ঝুপ-শ্বাগ-লাবণ্য সবই অপরের জন্য বিলিয়ে দিয়ে ফুল ধন্য হয়। মানবসমাজেও এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা অন্যের কল্যাণে নিজের সমস্ত অর্জন উৎসর্গ করেন। বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কার মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে। সমাজসেবা করে নিজের জীবন তুচ্ছ করে সমাজকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়। পরার্থপরতা একটি

মহৎ গুণ। পরের উপকারে নিজেকে বিসর্জন দিলে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দ অনুভব করা যায় এবং নিজের দৃঢ়খ-বেদনাও ভুলে থাকা যায়। স্বার্থচিন্তা মানুষকে সুখ দিতে পারে না। আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষকে বিরুত করে তোলে।

**সিদ্ধান্ত :** পুঞ্জকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করে মানবকল্যাণের ব্রত গ্রহণ করলে অনিবচনীয় তৃষ্ণি অনুভব করা সম্ভব।

ছয়.

### ইটের পর ইট মধ্যে মানুষ কীট

**মূলভাব :** নগরসভ্যতার পীড়নে মানুষের জীবন আজ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। শহরের ক্রত্রিমতায় মানুষ ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হারিয়ে আজ কীটে পরিণত হয়েছে।

**সম্প্রসারিত ভাব :** নদী-নালা-খাল-বিল-পাহাড়-অরণ্য প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত দান। কিন্তু মানুষ সব সময়ই আধিপত্যবাদী। সে প্রকৃতির ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইটের পরে ইট গেঁথে একটার পর একটা দালান তৈরি করে নগর সৃষ্টি করেছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে প্রকৃতির প্রত্যাশিত বিকাশ। হারিয়ে যাচ্ছে ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়, সুমিষ্ট বায়ুপ্রবাহ, নদীর কল্খনি। সেই মমতাময় ও স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিকে দখল করে নিয়েছে এখন বড় বড় অট্টালিকা, বায়ু ও শব্দদূষণ, তীব্র যানজট ও কোলাহল। মানুষ এখানে স্বাভাবিকভাবে শ্বাসঘুরণ করতে পারে না। শহরে গ্রামের সেই মিলনোন্মুখ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ নেই, তার বিপরীতে আছে পরম্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এখানে কেউ কারো সুখ-দুঃখের অংশীদার হয় না। প্রত্যেকেই এখানে বিচ্ছিন্ন দ্বাপের মতো বসবাস করে। ফলে আরণ্যক ভূমিকে ধ্বংস করে মানুষ যতই যন্ত্রসভ্যতার বড়াই করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ নগরসভ্যতার যাঁতাকলে পড়ে ভেতরে-বাইরে নিঃশ্ব হয়ে কীটে পরিণত হচ্ছে। জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিখরে উঠেও মানুষ আজ ক্লান্ত, অবসন্ন। প্রকৃতি ধ্বংস করার কারণে মানুষ এখন প্রতিমুহূর্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ে শক্তি থাকে। সে আজ মুক্ত পরিবেশের জন্য ব্যতিব্যস্ত। সে একটু নির্মল বাতাস সেবন করতে চায়, বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে চায়, প্রাণখুলে কথা বলতে চায়, সহমর্মী হতে চায় একে অন্যের। তাই আবার সে ফিরে পেতে চায় সেই প্রসন্ন, সুন্দর, স্নিখ় গ্রাম।

**সিদ্ধান্ত :** নগর মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে কিছুটা সহজ করলেও তার স্বাচ্ছন্দ্যকে নষ্ট করে দিয়েছে। নগর মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশে অস্তরায় সৃষ্টি করেছে।

সাত.

### বন্যেরা বনে সুন্দর শিখরা মাতৃক্রোড়ে

**মূলভাব :** প্রকৃতির সবকিছুই একটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে এবং সেই সৌন্দর্য যথোপযুক্ত পরিবেশেই স্বতঃস্ফূর্ত ও আকর্ষণীয়।

**সম্প্রসারিত ভাব :** সৌন্দর্য প্রকৃতির এক মহামূল্যবান দান। কোথায় সেই সৌন্দর্য সবচেয়ে নান্দনিক তা

প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দেয়। নির্দিষ্ট পরিবেশের ব্যতায় ঘটলে সৌন্দর্যের স্বাভাবিক উজ্জ্বল্য নিষ্পত্ত হয়ে যায়। বন্য প্রাণীরা বনেই সুন্দর, পাখি মুক্ত আকাশে। ফুল সুন্দর গাছে, মাছ স্বাভাবিক জলে। কিন্তু বন্য প্রাণীকে লোকালয়ে, পাথিকে খাচায়, ফুলকে ফুলদানিতে, মাছকে ডাঙায় রাখলে তাদের জীবনের গতি ব্যাহত হয়, সৌন্দর্যের হানি ঘটে, কখনো কখনো জীবননাশের আশঙ্কা তৈরি হয়। এরা প্রত্যাশিত পরিমগ্ন হারিয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠে। শিশুরও যথার্থ স্থান মাঝের কোল। মাঝের কোলে শিশুকে যতটুকু মানায়, অন্য কোথাও তা সম্ভব নয়। নিজেদের শখ-আঙুদ পূরণের জন্য মানুষ কখনো কখনো কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে বন্য প্রাণী, পাখি, মাছ পোষার চেষ্টা করে, কিছুটা হয়তো সফলও হয়। কিন্তু সেই সব প্রাণীর জীবনের ছন্দ নষ্ট হয়, ব্যাহত হয় যথার্থ বিকাশ। তাই কৃত্রিমতা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু প্রাণীর আবাস নয়, মানুষের জীবনেও কৃত্রিমতা কাম্য নয়। কখনো কখনো মানুষ মুখোশ পরে তার যথার্থ রূপকে ঢেকে কৃত্রিম আচরণ করে। ময়ূরের পেখম লাগালেই কাক কখনো ময়ূর হয় না।

**সিদ্ধান্ত :** যার যেখানে স্থান, তাকে সেখানেই থাকতে দেওয়া উচিত। প্রকৃত রূপেই সবকিছু সুন্দর, কৃত্রিমতা স্বতঃস্ফূর্ততার অন্তরায়।

আট.

### সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

**মূলভাব :** মানুষে মানুষে অনেক ধরনের বিভেদ-বৈষম্য থাকতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে আমরা সবাই মানুষ।

**সম্প্রসারিত ভাব :** সব মানুষ একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর একই জল-হাওয়ায় আমরা বেড়ে উঠি। আমাদের সবার রক্তের রং লাল। তাই মানুষ একে অন্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ভৌগোলিকভাবে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, অথবা আমরা যে যুগেরই মানুষ হই না কেন, আমাদের একটি পরিচয় আমরা মানুষ। কখনো কখনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা জাত-কুল-ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য তৈরি করে মানুষকে দূরে ঠেলে দিই, এক দল আরেক দলকে ঘৃণা করি, পশ্চাতে ফেলতে চাই, পরম্পর হানাহানিতে লিপ্ত হই। কিন্তু এগুলো আসলে সাময়িক। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আমরা একে অন্যের পরম সুহৃদ। আমাদের উচিত সবাইকে আত্মের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা। প্রত্যেককে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া এবং তার অধিকার সংরক্ষণে একনিষ্ঠ থাকা। মানুষের মধ্যে নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, আশরাফ-আতরাফ, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, কেন্দ্রবাসী-প্রান্তবাসী এমন ভাগাভাগি কখনোই কাম্য হতে পারে না। তাতে মানবতার অবমাননা করা হয়। তাই আধুনিক কালে এক বিশ্ব, এক জাতি চেতনার বিকাশ ঘটছে দ্রুত। মানব জাতির একই একাত্ম-ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে যুগে যুগে, দেশে দেশে মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ কমে আসবে। মানুষ সংঘাত-বিদ্যেষমুক্ত শান্তিপূর্ণ এক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সর্বত্র মনুষ্যত্বের জয়গাথা ঘোষিত হবে।

**সিদ্ধান্ত :** সব ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, বিশ্বদ্বন্দ্বভাবে ভালোবাসতে পারলেই বিশ্বে প্রার্থিত সুখ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে।

## আবেদনপত্র ও চিঠি

এক. জরিমানা মওকুফের জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদন।

তারিখ : ঢৱা নভেম্বর ২০২০

বরাবর

অধ্যক্ষ

আলীপুর সিনিয়র মাদরাসা, ঢাকা।

মাধ্যম : শ্রেণিশিক্ষক।

বিষয় : জরিমানা মওকুফের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার মাদরাসার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। আমি সাধারণত প্রতি মাসের নির্ধারিত তারিখেই আমার বেতন পরিশোধ করে থাকি। কিন্তু এ মাসে বাবা টাকা পাঠাতে দেরি করায় নির্দিষ্ট দিনে বেতন পরিশোধ করতে পারি নি, যে কারণে আমার জরিমানা হয়েছে। আমি আজ বেতন পরিশোধ করতে চাই। কিন্তু আমার পক্ষে জরিমানা দেওয়া কষ্টকর।

অতএব, বিনীত আবেদন এই যে, সহদয় বিবেচনার মাধ্যমে জরিমানা মওকুফ করে আমার বেতন পরিশোধ করার অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র

ফয়সাল আহমেদ সুমন

শ্রেণি : সপ্তম

রোল নম্বর : ৯

দুই. স্কুলে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন।

তারিখ : ৩০ আগস্ট ২০২০

বরাবর

অধ্যক্ষ

ইসলামপুর ফাজিল মাদরাসা

জামালপুর।

**বিষয় :** সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের মাদরাসার টিউবওয়েলটি আসেনিকমুক্ত না হওয়ায় আমরা খাওয়ার পানির বিশেষ সংকটে আছি। এ অবস্থায় আমাদের মাদরাসায় দ্রুত একটি আসেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করা দরকার।

অতএব, জনাবের নিকট বিনীত আবেদন, জরুরি ভিত্তিতে একটি আসেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক

ইসলামপুর ফাজিল মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে

শহিদুল আলম

শ্রেণি : ৭ম

রোল : ০৫

তিন. তোমার এলাকায় পাঠাগার স্থাপনের জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট একটি আবেদন পত্র লিখো।

তারিখ : ২ৱা জুন ২০২০

### বরাবর

#### উপজেলা চেয়ারম্যান

গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদ

রাজশাহী।

বিষয় : গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ায় একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সমানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ায় হাইস্কুল ও প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ জনসংখ্যা প্রায় দুই হাজারের ওপরে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, এখানে কোনো পাঠাগার নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানচর্চা, মানসগঠন ও সৃজনশীল চেতনা বিকাশে একটি পাঠাগার খুবই প্রয়োজন। এ ছাড়া এলাকায় দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই। এখানে একটি পাঠাগার হলে তরঙ্গরাও তাদের অলস সময়কে জ্ঞানচর্চার মতো প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করতে পারবে।

অতএব, গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ায় সব বয়সের জনসাধারণের উপকারের কথা বিবেচনা করে অতিসত্ত্ব এখানে একটি পাঠাগার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

### নিবেদক

গোদাগাড়ী পূর্বপাড়ার জনসাধারণের পক্ষে

রোদেলা শারমিন

চার. জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য ৪র্থ (চতুর্থ) ঘণ্টার পর ক্লাস স্থগিতের জন্য আবেদন।

তারিখ : ১৪ই আগস্ট ২০২০

বরাবর

অধ্যক্ষ

বেগুনহাটি কামিল মাদরাসা

কাপাসিয়া, গাজীপুর

**বিষয় :** জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য ৪র্থ ঘণ্টার পর ক্লাস স্থগিতের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, আমাদের মাদরাসায় আগামীকাল ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করা হবে। শোক দিবসের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি শ্রেণিকেই কোনো না কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের ওপর দায়িত্ব পড়েছে মধ্যসজ্জা। আগামীকালের শোক দিবসের সার্বিক কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য আজ ৪র্থ ঘণ্টার পর ক্লাসসমূহ স্থগিত করলে ভালো হয়।

অতএব, জনাবের নিকট বিনীত আবেদন, ৪র্থ ঘণ্টার পর ক্লাসসমূহ স্থগিত করে বাধিত করবেন।

**বিনীত নিবেদক**

আপনার একান্ত বাধ্যগত ছাত্র

মোহন আফজাল পৃথিবী

শ্রেণি : সপ্তম

রোল : ০৩

**পাঁচ.** তোমার ছাত্রাবাস জীবনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তোমার মাকে পত্র লেখ ।

শাহজাদপুর

সিরাজগঞ্জ

১৪ই জুন ২০২০

শ্রদ্ধেয় আমা

আমার সালাম নিও । বাবাকে আমার সালাম দিও । তুমি ও বাবা কেমন আছ? তোমাদের জন্য আমার সব সময়ই চিন্তা হয় । নিজেদের শরীরের প্রতি যত্ন নিও । আমি এক সঙ্গাহ আগে আমার মাদরাসার ছাত্রনিবাসে উঠেছি । ছাত্রনিবাসের পরিবেশ খুবই ভালো । বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রীরা এখানে থাকে । ছাত্রীরা পরম্পরের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল । যে কারণে কারো কোনো সমস্যা হয় না । অবসর সময়ে অনেকে একসাথে গল্প করি । আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যায় যেমন সবাই একত্রে আড়ডা দিই, অনেকটা সেই রকম । ছাত্রনিবাসের মধ্যেই একটি ছোট পাঠাগার আছে । এখানে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের বই আছে । ওখানে বসে বই পড়া যায় আবার তিন দিনের জন্য কক্ষেও নিয়ে আসা যায় । আমার কক্ষে যে মেয়েটি আছে, সেও ৭ম শ্রেণির ছাত্রী । ওর নাম মণি । ও খুলনার মেয়ে । মণি খুবই সুন্দর গজল গায় । তোমাদের জন্য মন খারাপ হলে মণি আমাকে গান শোনায় । আমার কক্ষটা চারতলায় । কক্ষের জানালায় দাঁড়ালে সবুজ গাছের উপর দিয়ে সুন্দর আকাশ দেখা যায় । ছাত্রনিবাসে একটি মিলনায়তন আছে, সেখানে ক্যারয় ও টেবিল টেনিস খেলা যায়, শীতের সময় ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা করা হয় । প্রথম প্রথম ছাত্রনিবাসের খাবার খুব ভালো লাগত না, তখন তোমার রান্নার কথা খুব মনে হতো । কিন্তু এখন অভ্যন্তর হয়ে গেছি । প্রতি মাসে দু বার বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, তখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে অনেকটা উৎসবের মতো । আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না । আশা করি আমি ভালোই থাকব ।

স্বচ্ছ কেমন আছে? ওর লেখাপড়ার প্রতি নজর রেখো । রোজার ছুটি হলেই আমি বাড়ি চলে আসব । আমার জন্য দোয়া করো ।

ইতি

তোমাদের আদরের

শাহনাজ পারভীন

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট
শাহনাজ পারভীন শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	মাহমুদা খানম কলেজ রোড, সিরাজগঞ্জ	

ছয়. তোমার জীবনের লক্ষ্য কী জানিয়ে বড় ভাইকে চিঠি লেখ ।

দোহার, ঢাকা

১৩ ই জানুয়ারি ২০২০

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই,

আমার সালাম নেবেন। বাড়ির সকলে আমরা ভালো আছি। আমার স্কুলের ক্লাস ভালোভাবে শুরু হয়েছে। আমিও পড়াশোনা শুরু করেছি। আদরের ছোট বোন অত্রিকে ভর্তি করানো হয়েছে। আপনার কথামতে আমরা দু'জনে একসঙ্গে স্কুলে যাই। আপনি চিন্তা করবেন না।

আপনি জানতে চেয়েছিলেন আমি বড় হয়ে কী হতে চাই। আমাদের জলীল স্যারকে তো আপনি চেনেন। আমি স্যারকে খুব পছন্দ করি। স্যার আমাদের খুব ভালোভাবে পড়ান। পড়ানোর সময় আমরা কীভাবে বড় হতে পারব, দেশের মানুষের সেবা করতে পারব, পৃথিবীকে আরো সুন্দর করতে পারব—এসব বলেন। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের জন্য এখনো আদর্শ শিক্ষক অনেক বেশি দরকার। তাই আমি ঠিক করেছি, ভালোভাবে পড়ালেখা শেষ করে আমি শিক্ষক হব।

আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। আমাদের এলাকার সবাই ভালো আছেন। দাদা-দাদি এখন বেশ সুস্থ। আপনি বাড়ি আসার সময় আমার জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্রিকা নিয়ে আসবেন। ভালো থাকবেন।

ইতি

আপনার আদরের

সুমন রহমান

প্রেরক:	প্রাপক	ডাকটিকিট
সুমন রহমান	মোয়াজ্জেম হোসেন নীলু	
মিরগাবাড়ি, চরকাবা	১৯/৫০ রূপনগর	
দোহার, ঢাকা ১৩৩১	পল্লবী, ঢাকা ১২১৬	

আট. তোমার এলাকার একটি লোকজ উৎসবের বর্ণনা দিয়ে এবাসী বন্ধুকে পত্র লিখ ।

বিলকিস বেগম

রাজানগর, চট্টগ্রাম

তারিখ : ৮ই মে ২০২০

প্রিয় রাবেয়া,

আমার প্রীতি ও ভালোবাসা নাও । আজ প্রায় দুই বছর হতে চলল তুমি মালয়েশিয়া চলে গেছ । আমাদের দুজনের জীবন যে প্রাণচার্খল্যে ভরপুর ছিল, তা কিছুতেই ভুলতে পারি না । তুমি তোমার বাবা-মার সঙ্গে মালয়েশিয়া চলে যাওয়ার পর এখনো আমাদের এলাকার নানা অনুষ্ঠান সেই আগের মতোই আমরা উপভোগ করি । তবে আমরা তোমার অভাব বোধ করি । এবার আমাদের এলাকায় বেশ বড় আয়োজনে বৈশাখী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে । আজ আমি সেই উৎসবের কথা বলতেই তোমাকে চিঠি লিখছি ।

তুমি তো জান, আমাদের সারা বাংলাদেশেই পহেলা বৈশাখ নববর্ষ হিসেবে পালিত হয় । এখন আমাদের রাঙুনিয়াতেও পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ব্যাপক আয়োজনে নানা অনুষ্ঠান হয় । রাজানগরে এবারই প্রথম বৈশাখী উৎসবের অনুষ্ঠান হয় । স্বপন, পুলক, হ্যাপী, চৈতালী, অনিক, দীপা, কুমকুম, নাহার, রাজু, সজল এবং আমি সবাই মিলে সকাল সকাল আমাদের বিদ্যাময়ী মাদরাসার মাঠে চলে যাই । প্রথমে ওখান থেকে সকাল সাতটায় শুরু হয় বৈশাখী শোভাযাত্রা । নানা রঙের ব্যানার-ফেস্টুন হাতে আমরা র্যালিতে অংশ নিই । র্যালি শেষ করে মাদরাসার মাঠে চলে আসি । ওখানেই বিশাল আকারে মেলা বসেছে । মাঠের উত্তর দিকে চড়কগাছের আয়োজন, তার পাশে বসেছে চুড়ির দোকান । ছোট ছোট বাঞ্ছে নানা ধরনের চুড়ির পসরা সাজিয়ে বসেছে মহিলারা । তার পাশে চানাচুর ও নিমকি ভাজা ও বিক্রি চলছে । আমি গরম নিমকিভাজা আধা কেজি কিনে সবাই মিলে খেয়েছি আর ঘুরে ঘুরে মেলাটা দেখেছি । মাঠের পূর্ব কোণে বাঁশ-বেতের নানা গৃহস্থালি দ্রুব্য নিয়ে বসেছে বিক্রেতারা । ওখানেও বেশ ভিড় । তার পাশেই নানা ধরনের বেলুন, বাঁশির পসরা বসেছে । আমি আমার ছোট বোন প্রিয়স্তির জন্য বেলুন ও বাঁশি কিনেছি । ওর জন্য রঙিন ফিতাও কিনেছি । দীপা তো যেটা দেখে সেটাই কেনে এমন অবস্থা ওর । হাতে যে কয়টা টাকা ছিল, সব টাকায় দীপা ওর ভাই-বোনের জন্য নানা জিনিসপত্র কিনেছিল । রাজু, সজল, হ্যাপী, অনিক, স্বপন বাঁশের তৈরি কলমদানি কিনেছিল । আমরা সবাই মিলে চড়কগাছেও উঠলাম । ওখানে উঠে তো চৈতালী ভীষণ ভয় পেয়ে গেল । কিন্তু কি আর করা, দশপাক না খেয়ে তো আর নামা যাবে না । চৈতালী বলেছে, ও আর কখনো চড়কগাছে উঠবে না ।

আজ আর লিখছি না। তুমি ভালো থেকো। চাচা-চাচীকে শ্রদ্ধা দিও। তোমার সব খবর জানিয়ে  
আমাকে লিখো। তোমার জন্য অসীম ভালোবাসা রইল।

ইতি

বিলকিস বেগম

AIR MAIL	STAMP
<p>FROM            BILKIS BEGUM            RAJA NAGAR            CHITTAGONG            BANGLADESH</p>	<p>TO            RABEA KHATUN            26, KUALALAMPUR            MALAYSIA.</p>

সমাপ্ত



দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিনয়ীকে সবাই পছন্দ করে

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে  
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য